

সাম্প্রতিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-থ

ল. সেলেজনেভ, ড. ফেতিসভ

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম





সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-থ

ল. সেলেজনেভ, ড. ফেতিসভ

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ : ননী ভৌমিক

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-থ গ্রন্থমালার
সম্পাদকমণ্ডলী : ফ. ভোলকভ (প্রধান সম্পাদক), ইয়ে.
গদ্বাঙ্স্কি (প্রধান সহসম্পাদক), ফ. বর্ল্যাৎস্কি,
ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন, ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ,
ফ. ইউর্লভ

ABC социально-политических знаний

Л. Селезнев, В. Фетисов

ЧТО ТАКОЕ НАУЧНЫЙ КОМУНИЗМ?

На языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

L. Seleznev, V. Fetisov

WHAT IS SCIENTIFIC COMMUNISM?

In Bengali

© Progress Publishers, 1985

বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৮
সোভিয়েত ইউনিয়নে মদ্রিত

0302030000—368
014(01)—88 300—88

ISBN 5-01-000810-6

সূচি

মুখবন্ধ	৫
প্রথম অধ্যায়। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — ন্যায়ের সন্ধান	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রণয়ন	২৯
তৃতীয় অধ্যায়। বর্তমান যুগের মূলগত চরিত্র বা অন্তঃসার	৫২
চতুর্থ অধ্যায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্কসবাদী- লেনিনবাদী তত্ত্ব	৭১
পঞ্চম অধ্যায়। কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য .	৮৯
ষষ্ঠ অধ্যায়। পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্ব	৯৯

সপ্তম অধ্যায়। সমাজতন্ত্র বিকাশের ধাপ . . .	১১১
অষ্টম অধ্যায়। জীবনযাত্রার সমাজতান্ত্রিক ধারা . . .	১২৫
নবম অধ্যায়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা . . .	১৩১
দশম অধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদের পীঠভূমিতে শ্রেণী সংগ্রাম	১৫০
একাদশ অধ্যায়। নিপীড়িত জাতিদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি	১৬৯
উপসংহার	১৯০
ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ	১৯৫

মুখবন্ধ

কোনো বিজ্ঞান পর্যালোচনার সময় সর্বাগ্রে স্থির করে নিতে হয় কী তার গবেষণার বিষয়বস্তু, লোকে তা থেকে কী পাবে, অর্থাৎ কী তার সামাজিক তাৎপর্য।

আধুনিক মানুষের জীবন অসাধারণ জটিল। অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, রাষ্ট্র, ব্যক্তিসত্তা — এতই বিভিন্ন দিক থেকে সমাজ চিহ্নিত। এই থেকেই দেখা দেয় সামাজিক বিজ্ঞানগুলির বহুলতা ও বৈচিত্র্য। কতকগুলি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে সামাজিক দেহসত্তার এক-একটা 'অংশ', অন্যগুলি তাকে দেখে সমগ্রভাবে।

এই বইটিতে বিবেচিত হয়েছে সেইসব প্রশ্ন যা কেবল একটি বিজ্ঞানের অন্তর্গত, যথা — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব।

প্রাচীন একটি প্রাজ্ঞ উক্তিতে বলে: 'উত্তম তত্ত্বের চেয়ে বেশি ব্যবহারিক কিছু নেই।' বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ক্ষেত্রে কথাটা পুরোপুরি প্রযোজ্য। মার্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদের একটি মূল্য হিশেবে তা মেহনতিদের স্বার্থে সামাজিক জগৎটার প্রজ্ঞান ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটা প্রবল অস্ত্রের কাজ করে। তবে সমস্ত জটিল অস্ত্রের মতো একেও আয়ত্ত করতে হলে প্রয়োজন বেশ কিছু প্রয়াস, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য। এ বিজ্ঞানের আয়ত্তে ব্যয়িত শ্রম পুঁজিয়ে যাবে প্রজ্ঞান আর আবিষ্কারের আনন্দে, বর্তমান দুনিয়ার জটিল সব প্রশ্নের মীমাংসায়, সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে, সামাজিক অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তির সচেতন যোগদানে।

লেখকেরা চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব বোধগম্য রূপে এ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য দেখাতে, তার প্রধান প্রধান দিকগুলিকে সুপ্রসার প্রয়োগে উপস্থিত করতে। বড়ো বড়ো প্রতিটি সমস্যা প্রথমে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অন্যান্য প্রশ্ন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে তার ওপর।

তাহলে যাত্রা শুরু করা যাক। প্রথমে অতীতে খানিকটা চোখ বুন্ডিয়ে দেখব বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের অঙ্কুরোদগম আর উদ্ভব হয়েছিল কিভাবে। তারপর আমাদের কালের মূল প্রবণতাগুলি আর এ বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সঙ্গে পরিচয় শেষ হবে মানবসমাজের ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপাত করে।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — ন্যায়ের সন্ধান

সমাজতন্ত্র কথাটা লোকে শুনেনাছে অনেকদিন আগেই। ন্যায়পরায়ণ একটা সমাজের স্বপ্ন হিশেবে তার জন্ম। ধারণাগর্ভিল ছিল ইউটোপীয়, কল্পনাশ্রয়ী, কিন্তু টিকে থেকেছে অনেকদিন। বহু দেশে তার উৎসাহী পক্ষপাতী আর ভক্ত দেখা দেয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ায়, শুরুর হল তার নতুন জীবন — সাবালকত্ব, সারা বিশ্বে প্রচারের যুগ, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, বাস্তবে, লক্ষ লক্ষ লোকের সামাজিক সংগ্রামের গ্রিসাকলাপে তার রূপায়ণ। যে তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বলা হচ্ছে, তাকে বদ্বতে হলে তার উদ্ভব ও রূপলাভের ইতিহাস জানা দরকার।

প্রতিটি নতুন বিজ্ঞান দেখা দেয় শূন্য থেকে নয়, তার আগে থেকে বিদ্যমান তত্ত্বাদির ওপর ভর দিয়ে। সে বিজ্ঞান হয় যতই তাৎপর্যপূর্ণ, ততই তা পূর্ববর্তী মনীষীরা যা করে গেছেন সেটাকে আত্মস্থ করে, তাতে পুষ্ট হয়, সেটাকে টেলে সাজে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের ক্ষেত্রেও তার পূর্ববর্তী ছিল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা। সেগুণ্ডার সঙ্গে পরিচয় থাকলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বোঝা যাবে ভালো। তা থেকে দেখা যাবে: বিভিন্ন দেশ ও জাতির মেহনতি জনগণ ও অগ্রণী মানুষেরা বহুকাল থেকে এমন একটা ন্যায্য সমাজ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যা সামাজিক ন্যায়, সর্বজনীন শ্রম, প্রতিটি মানুষের জন্য যত্ন ও শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্বপ্নগুলিই রূপ নিয়েছিল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রে, যার ইতিহাস চিত্তাকর্ষক এবং নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ।

প্রথম সমাজতন্ত্রীদের কী স্বপ্ন ছিল?

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা বলে ধরা হয় ইংরেজ টমাস মুরকে (১৪৭৮-১৫৩৫)। তিনি যে বইটি লিখেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত নাম 'ইউটোপিয়া'। এই থেকে ১৬-১৯শ শতকের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার এই ধারাটার নাম হয় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র।

সুখসমৃদ্ধ সুদূর এক দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল জনৈক সমুদ্রচর, তার কথিত কাহিনী হিশেবে বইটি লেখা। গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে ইংল্যান্ডের তদানীন্তন ব্যবস্থার

তীর সমালোচনা: ধনী কর্তৃক দরিদ্রের নির্মম শোষণ, গ্রাস মনোবৃত্তি, ধনীদের দুর্নীতির কথা, পরে সুন্দর এক দ্বীপে একেবারেই অন্য ধরনের সুন্দর এক জীবন বর্ণনা করেছেন লেখক। সেখানে বড়ো বড়ো সুন্দর সমস্ত শহরের পরিকল্পনা একই রকমের, স্বাধীন, সমাধিকারী লোকেদের জন্য একই ব্যবস্থা, একই রীতিনীতি। শহর ছাড়াও দেশে আছে কৃষি মহাল। শহর আর গ্রামে নাগরিকেরা থাকে বদলা-বদলি করে। পালা করে সমস্ত রকমের শ্রমে তারা লিপ্ত। কার্যিক শ্রম থেকে মুক্ত কেবল বিজ্ঞানীরা।

দ্বীপে পরজীবী কেউ নেই। সবাই খাটে দিনে ছয় ঘণ্টা। তাই বিজ্ঞান ও শিল্পকলা নিয়ে চর্চার সময় পায় সকলেই। এ রাষ্ট্রে টাকা নেই। সোনার কোনো দাম নেই লোকেদের কাছে। যাকিছু উৎপাদিত হয়, সব থাকে সামাজিক ভান্ডারে, সেখান থেকে প্রত্যেকে নেয় ঠিক যতটা তার দরকার। বাড়তি কিছু জমিয়ে রাখার ইচ্ছে হয় না কারো — তার কোনো দরকার নেই এখানে। প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন চলে দেশটায়। কেমন করে সেটা সম্ভব? মূর ব্যাখ্যা করেন, প্রথমত, সবকিছুই রয়েছে যথেষ্ট প্রচুর। দ্বিতীয়ত, এমন আশংকার কারণ নেই যে যা দরকার কেউ তার বেশি দাবি করতে চাইবে। কোনো কিছুতে কখনো তার অনটন হবে না, এমন দৃঢ় বিশ্বাস যার রয়েছে, সে বাড়তি কিছু চাইবে কেন?

দ্বীপের সমস্ত লোক খাওয়া-দাওয়া করে সামাজিক ভোজনালয়ে। প্রতিটি নাগরিকের বা চাহিদা, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক আর প্রয়োজনীয়।

এ রাষ্ট্রে সবাই সমান, ব্যবস্থাপনা চালায় অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত লোকেরা।

মুরের বইটি ছিল ইংলণ্ডে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার প্রতি দ্বন্দ্বাহ্বান, লোকে সেখানে দরিদ্র আর ধনীতে বিভক্ত, প্রথমোক্তরা পড়ে থাকছে নিঃস্বতা আর অধিকারহীনতায়, শেষোক্তরা গা ভাসাচ্ছে বিলাসে আর স্বেচ্ছাচারে।

টমাস মুরের জীবনের শেষটা গম্ভীৰ্শ। রাজার আদেশে প্রাণদণ্ডিত হন তিনি।

অন্যান্য অনেক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের জীবনও দঃসহ ও শোকাবহ, যেমন: ত. কাম্পানেল্লা, দ. উইনস্টেনলি, জ. মেলিয়ে, গ. মারি, গ. বাবেফ, আ. সাঁ-সিমোঁ, শ. ফুরিয়ে, র. ওয়েন, ভ. বেলিন্‌স্কি, আ. গেৎসেন, ন. চের্নিশেভস্কি... বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে তাঁদের দিন কেটেছে, জাতিতে তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন। কিন্তু তাঁদের সবারই ঐকান্তিক স্বপ্ন ছিল একটাই — এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে শ্রমের ফল ভোগ করবে খোদ শ্রমকারীরাই, যেখানে একজন মানুষ অন্যকে পীড়ন করে না, যেখানে লোকেদের মধ্যে শ্রেণীগত, সম্প্রদায়ভেদী, জাতীয় বেড়াগুলো বিলুপ্ত হয়েছে, যেখানে সবাই সমান। আত্ম হৃদয়ে তাঁরা নতুন সুখী জীবনের পথ সন্ধান করেছেন, সামাজিক অন্যায্য, অসাম্য, দারিদ্র্য আর অধিকারহীনতা দূর করার জন্য ডাক দিয়েছেন লোকেদের। আর তার জন্য নিদারুণ মূল্য দিতে হয়েছে তাঁদের। মানববাদী মনীষীদের তাড়না করেছে শাসক শ্রেণীরা। তাঁদের পাঠিয়েছে

নির্বাসনে, জেলে পদরেছে আর কখনো কখনো, টমাস মুরের মতো, প্রাণ হরণ করেছে।

সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করে তিনজন মনীষীর মতবাদ : ফরাসি সাঁ-সিমোঁ আর শ. ফুরিয়ে এবং ইংরেজ র. ওয়েন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসে কেন তাঁরা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী?

আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্সে ঘটে বৃজোঁয়া বিপ্লব। সামন্তদের জায়গায় আসে নতুন শ্রেণী — বৃজোঁয়া। সে সময়কার ফরাসি মননশীলেরা এ বিপ্লবের ওপর অনেক ভরসা রেখেছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, সামন্ত আর গির্জার প্রভুত্বকালে যে অন্যায, অজ্ঞতা, কুসংস্কারের রাজত্ব চলছিল, সে যুগটার অবসান হল। এবার সূর্য উঠবে, তার সমুজ্জ্বল কিরণতলে পৃথিবীতে দেখা দেবে চিরন্তন ন্যায, সমতা, লোকেদের মধ্যে সৌভ্রাত। কিন্তু বাস্তব জীবনে অচিরেই দেখা গেল যে সুবুদ্ধি আর ন্যাযের প্রত্যাশিত রাজত্বটা পরিণত হয়েছে মানুষ কতৃক মানুষ শোষণের, তাকে দাসত্বে বাঁধার নতুন ধরনে, একদলের ঐশ্বর্য আর বিলাস, অন্যদের দারিদ্র্য আর অধিকারহীনতার বৃদ্ধিতে। আগেকার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষত্রুটি স্তান হয়ে গেল নতুন, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃষ্টান্তের কাছে।

পুঁজিতন্ত্র ওদিকে ইউরোপে ক্রমেই পাকাপোক্ত আসন গেড়ে বসতে থাকে, অন্যান্য ভূখন্ড আর মহাদেশেও বিজয়াভিযান চালাতে শুরুর করে। এবং সর্বত্রই পুঁজিতন্ত্র আর ঔপনিবেশিকতা লোকেদের জন্য নিয়ে

আসে নতুন দৃষ্টাংশ, উদ্ঘাটিত করে তার অমানুষিকতা আর বিরোধসংকুলতা।

উন্নত জীবনের উদয়ে যাদের বিশ্বাস ছিল, তিন্ত আশাভঙ্গ হয় তাদের। দেখা দিল এমন মানুষ যারা তাঁর সমালোচনা শুরু করল বুদ্ধজ্যোত্সব্য ব্যবস্থার, অন্য রকমের, তাদের মতে ন্যায্য ও মানবিক সমাজের খসড়া রচনা করতে থাকল তারা।

ইতিমধ্যে মানবিক প্রজ্ঞা নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করেছে: বিজ্ঞানীরা ক্রমেই প্রবেশ করছেন প্রাকৃতিক রহস্যের গভীরে, গড়ে তুলছেন শক্তি আর দক্ষতায় আশ্চর্য সব যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম। মনন, বিজ্ঞান, টেকনিকের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কেন পুনর্গঠিত করা হবে না মানুষের জীবন? সৃষ্টির ভবিষ্যতে নয়, এখনই কি একটা সৃষ্টি সমাজ গড়া চলে না? এইভাবেই প্রশ্নটা রেখেছিলেন সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েন আর প্রত্যেকেই তার উত্তর দিয়েছেন নিজের মতো করে।

আঁরি সাঁ-সিমোঁর (১৭৬০-১৮২৫) জন্ম কাউন্ট পরিবারে, স্বকালের বড়ো বড়ো ঘটনায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৭৭৫-১৭৮৩) এবং ফরাসী বুদ্ধজ্যোত্সব্য বিপ্লবে (১৭৮৯-১৭৯৪) অংশ নেন। নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি দর্শন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং খুবই দারিদ্র্যে দিন কাটান।

সাঁ-সিমোঁর মতে, মানবসমাজ এসেছে বিকাশের তিনটি পর্যায় দিয়ে। প্রথম পর্যায়ে ছিল ধর্মের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগ্রাম চলে ধর্ম আর

বিজ্ঞানের মধ্যে। তৃতীয় পর্বে জয়লাভ করবে বিজ্ঞান। তৃতীয় পর্বটা যেহেতু শূন্য হয়ে গেছে, তাই বিশেষ একটা সামাজিক বিজ্ঞান প্রণয়ন করা উচিত যার সাহায্যে মানুষের জীবন বদলানো যাবে। এ বিজ্ঞানের প্রধান কর্তব্য হল সুখী সমাজের খসড়া রচনা, যাকে পরে বাস্তবে পরিণত করতে হবে।

সাঁ-সিমোঁ ভেবেছিলেন, এরূপ প্রকল্প রচনা কাল ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অপেক্ষা রাখে না। এটা একজন প্রতিভাধর মানুষের প্রয়াসের ফল। পাঁচশ বছর আগে তেমন প্রতিভা দেখা দিলে মানবজাতি বহু কষ্টভোগ থেকে মুক্তি পেত। এতদিন পর্যন্ত তেমন পরিব্রাতা পাওয়া যায় নি। তাই এখন দরকার মানবজাতিকে দ্রুত মুক্তি দেওয়া, নতুন জীবনের খসড়া রচনা করা।

ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে কিরকম মনে হয়েছিল? শাসন চালাচ্ছে সামর্থ্যধর গুণী লোকেরা। ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা পার্লামেন্ট, তিনটি কক্ষ নিয়ে তা গঠিত: উদ্ভাবন কক্ষ, গবেষণা কক্ষ, কর্ম কক্ষ। ক্ষমতার এই সংস্থাটি একই সময়ে অর্থনৈতিক-পরিকল্পনার সর্বোচ্চ সংস্থা। অর্থনৈতিক জীবন যেহেতু পরিকল্পিত হচ্ছে, তাই নতুন সমাজে নৈরাজ্য, বেকারি, দারিদ্র্য, বড়ুক্ষা থাকবে না। সমাজের সমস্ত দিক পুনর্গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ব্যক্তির জীবন পরিস্থিতির উন্নতি, তার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকাশ ও বিকাশ।

কী উপায়ে নতুন সমাজব্যবস্থায় পৌঁছন যাবে এবং তাতে করে পীড়ন, দারিদ্র্য দূর হবে, সমস্ত লোকের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা আর সম্মতি দেখা দেবে

বলে তিনি ভেবেছিলেন? তাঁর মতে সেটা সম্ভব হতে পারে সামাজিক ব্যবস্থার তাঁর রচিত প্রকল্পের প্রচার মারফত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর ধ্যানধারণা কার্যে পরিণত হলে শৃঙ্খল গরিবরা নয়, ধনীরাও লাভবান হবে। কেননা বর্তমান সমাজ তো সকলের পক্ষেই খারাপ, একদল দারিদ্র্যে গড়াচ্ছে, অন্যেরা নাকি নিজেদের ঐশ্বর্যের জন্য বিবেক দংশনে ছটফট করছে। নতুন সমাজে সবাই হবে সম্মুখিত আর সুখী। সুতরাং অন্য ধরনের জীবনের সর্বাধিকার সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করা দরকার, তখন আপনা থেকে সে জীবন শুরুর হয়ে যাবে।

সামাজিক পুনর্গঠনের সাঁ-সির্মোঁ প্রস্তাবিত পথটা আসছে এই প্রত্যয় থেকে যে সামাজিক জীবনে প্রধান ব্যাপার হল আইডিয়া, চিন্তা, চেতনা। তাই এগুলা বদলালেই সমাজের সমস্ত দিকের পুনর্গঠনও হবে অনিবার্য। সেটা কি বিশ্বাস্য? মহান মানববাদীর যে বিভ্রান্তি তার একটা কারণ কি এখানেই নিহিত নয়? তবে সে নিয়ে কথা হবে পরে, আপাতত আরেকজন বড়ো দরের চিন্তানায়ক, সাঁ-সির্মোঁর সমসাময়িক ও স্বদেশবাসী শ. ফুরিয়ের মতামত দেখা যাক।

সারা জীবন শার্ল ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) কাজ করেছেন নানা ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। তিনি বলতেন, মানুষের জন্ম সুখের জন্য। সুখ পাওয়া যায় যখন মানুষের স্বাভাবিক, বিচক্ষণ চাহিদাগুলো মেটে। সমাজের কর্তব্য হল প্রতিটি ব্যক্তির তেমন

চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা। সমাজ যদি তাতে অক্ষম হয়, তবে তা নিন্দনীয় ও অপসারণীয়।

অচল হয়ে যাওয়া, কুব্যবস্থিত একটা সমাজ বলে বদজেরা ব্যবস্থার প্রচণ্ড সমালোচনা করেন ফুরিয়ে। বহু মারাত্মক পাপের জন্য পুঞ্জিতন্ত্রকে ধিক্কার দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ সমাজের একটি বিশদ ছবি আঁকেন। সুখী সামঞ্জস্যের এই যে সমাজ, কেমন তার চেহারা?

বহু সমিতি বা ফ্যালাঙ্গ দিয়ে তা গড়া। এক-একটা ফ্যালাঙ্গ হল ১৬০০ জন করে লোক দিয়ে উৎপাদনী-পরিভোগী সমিতি। সবাই তারা থাকে বিরাট একটা ভবনে, যাতে আছে কর্মশালা, ভোজনালয়, গ্রন্থাগার।

নতুন সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ নেই। সবার উপকারের জন্য সবাই স্বেচ্ছায় খাটে। অভিশাপ থেকে শ্রম পরিণত হয় উপভোগ আর পরিতৃপ্তিতে। সেটা সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? সেটা ঘটেছে কারণ নিজের নিজের কোঁক অনুসারে লোকে অবাধে তাদের কাজে পালাবদল করে, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালায়, শ্রমের চরিত্র তাদের সৃজনধর্মী, সেজন্য প্রতিটি কর্মীর মধ্যেই তা উৎসাহের সঞ্চার করে।

সামঞ্জস্যের সমাজে নারীদের অধিকার পুরুষের সমান, সাংসারিক চাপ থেকে তারা মুক্ত। শিক্ষিত লোকেরা এখানে পরিণত হয় দেহে ও মানসে সর্বাঙ্গীণ বিকশিত ব্যক্তিতে। সাঁ-সিমোঁর মতো ফুরিয়েও মানুষে, তার আত্মিক ও নৈতিক শক্তিতে অগাধ বিশ্বাসী। প্রধান কাজ হল সেটা দেখে, উদ্ঘাটিত করে, বিকশিত করা।

ভবিষ্যৎ সুখী সমাজের প্রকল্প তো রচিত হল। কে এবং কিভাবে সেটা কার্যে পরিণত করবে? সম্ভবত ধনীদেব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তার সাহায্যে লোকেদের জীবন বদলাতে হবে? না, উল্টোটাই, নিজের পরিকল্পনা হাসিলের প্রধান ভরসা ফুরিয়ে রেখেছেন বিত্তবান শ্রেণীদের ওপর, তাদের টাকাপয়সা, পুঁজি আর শুল্ভেচ্ছার ওপর। শুধু তাদের চোখ খোলাতে হবে, বোঝাতে হবে নতুন ব্যবস্থার সুবিধা। এই উদ্দেশ্যে ফুরিয়ে রাজ, ওমরাহ, ব্যাংকার, কলওয়ালাদের কাছে চিঠি লেখেন। বহু বছর ধরে ধৈর্যসহকারে তিনি তাঁর দীনহীন গৃহে প্রতিদিন অপেক্ষা করেছেন ধনী পৃষ্ঠপোষকদের যারা তাঁর ভাবনাকে কাজে রূপ দেবে। ধনী অভ্যাগতের আশায় আর বসে থাকতে না পেরে ফুরিয়ে তাঁর জীর্ণ ফ্রক-কোর্টটি পরে দোকানে যেতেন গরিব প্যারিসবাসীর উপযোগী কিছু খাবার কিনতে। তাঁর সারা জীবনের সাধনা, দুঃখ-কষ্ট সয়ে রাত জেগে জেগে গড়া তাঁর সুখী সমাজের পরিকল্পনা রয়ে গেল ম্বপ্নই।

সাঁ-সিমোঁ আর ফুরিয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ পার্থক্য থাকলেও ভবিষ্যৎ সমাজের ধারণায় তাঁদের মধ্যে মিলও আছে অনেক। সমাজ পুনর্গঠনের যে উপায় ফুরিয়ে প্রস্তাব করছেন তা কি সাঁ-সিমোঁর মতোই নয়? তবে সাধারণীকরণ করা যাবে পরে। এখন দেখা যাক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের তৃতীয় বৃহৎ প্রবক্তা ইংরেজ ওয়েনের মতামত।

রবার্ট ওয়েনের (১৭৭১-১৮৫৮) জন্ম পেটি-

বুর্জোয়া পরিবারে, অসাধারণ গদুণী। ২০ বছর বয়সেই তিনি হন ম্যাগেস্টারের একটি ফ্যাক্টরির ডিরেক্টর, তিরিশ বছর নাগাদ স্কটল্যান্ডের একটি বৃহৎ উদ্যোগের পরিচালক। এঙ্গেলসের কথায়, ইনি ছিলেন, 'শিশুসুলভ মহৎ চরিত্রের লোক, সেইসঙ্গে পরিচালক হয়েই যেন জন্ম, যা খুব কম দেখা যায়।'* ওয়েন ছিলেন শূদ্ধ তাঁর ভাবনায় নয়, তার রূপায়ণেও আগ্রহী।

সমাজতন্ত্রের ভাবনায় ওয়েন চট করেই আসেন নি। প্রথমে তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার চোঁহন্দির মধ্যেই লোকেদের জীবন পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কারখানার অংশীদার-পরিচালক হিশেবে তিনি নিউ ল্যানার্ক চালু করেন নতুন ব্যবস্থা: কাজের ঘণ্টা কমান, গড়েন কিন্ডারগার্টেন, ইশকুল, হাসপাতাল, শ্রমিকদের জন্য সাহায্য তহবিল। এতে উদ্যোগটিরও আয় বাড়ে, আবার অধিবাসীদের রীতি-প্রকৃতিও বেশ উন্নত হয়। মাতলামি, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা যা এখানে লেগেই থাকত তা বেশ কমে যায়। এইসব নতুন প্রবর্তনায় ওয়েনের নাম ছড়ায় সারা ইউরোপে। কিন্তু যা করলেন তাতেই ওয়েন তুষ্ট থাকতে পারেন নি। এই সিদ্ধান্তে তিনি আসেন যে বুর্জোয়া সমাজ সর্বনাশা, কদর্য, তার জায়গায় আসা উচিত কমিউনিস্ট ধরনের সমাজ।

ভবিষ্যৎ সমাজ কিরকম হবে এবং কী করে তা

* Engels F. *Anti-Dühring*. — Moscow: Progress Publishers, 1975, 310.

স্থাপন করা যায় বলে ওয়েন ভেবেছিলেন? ৩০০ থেকে ৩০০০ লোক নিয়ে এক-একটা লোকালয় বা সমাজ গড়ে সেগুদিলিকে সারা বিশ্বে ছড়াতে হবে। লোকালয়ে থাকবে শহর আর গ্রামের সমস্ত সুবিধা, তার গলদ ছাড়া। সমাজের সভ্যতা পালা করে শিল্প আর কৃষি, কার্মিক আর মানসিক শ্রমে নিযুক্ত থাকবে, ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবে যন্ত্রকৌশল। উৎপাদনে ফুরিয়ের ক্ষেত্রে যেখানে প্রধান ভূমিকা নেয় কারিগরি, হস্তশিল্প কারখানা, ওয়েনের ক্ষেত্রে সে জায়গাটা নিয়েছে বৃহৎ শিল্প, যন্ত্রপাতি। ঘরকন্নাতেও তিনি যান্ত্রিক টেকনিক প্রয়োগের দাবি করেন। যে প্রবল উৎপাদনী শক্তি পূর্জিতন্ত্রে অল্প কয়েকজনের ধনবৃদ্ধির কাজে লাগে, নতুন সমাজে তা সকলের সম্বলতা বাড়াবে।

এ সমাজে থাকবে পণ্যের প্রাচুর্য। লোকেদের চাহিদা মিটবে সাধারণ সামাজিক ভান্ডার থেকে। সমাজের সদস্যরা খাওয়া-দাওয়া করে সাধারণ ভোজনালয়ে। বণ্টন প্রথম দিকে থাকবে প্রতিটি লোকের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, পরে উত্তরণ ঘটবে প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টনে। লোকেদের মধ্যে সমস্ত সম্পর্কই হবে ভালোবাসা আর পারস্পরিক সাহায্যের নীতি অনুযায়ী।

ওয়েনের মতে, নতুন সমাজে উত্তরণ ঘটতে পারে সাম্যবাদী ধ্যানধারণা প্রচারের ফলে, এক-একজন উদ্যমী অধিবাসীর দৃষ্টান্তমূলক ক্রিয়াকলাপ থেকে অধিবাসীদের সাধারণ সমবায়ে। সাঁ-সিমোঁ আর ফুরিয়েও ঠিক এই উপায়েই সমাজ পুনর্গঠনের কথা ভেবেছিলেন।

নিজের ভাবনাকে ওয়েন কার্বে পরিণত করার চেষ্টা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি জমি কিনে সেখানে স্থাপন করেন 'নতুন সামঞ্জস্য' নামে কমিউনিস্ট ধরনের এক সমাজ। প্রথমে তাতে কিছু সাফল্য দেখা গিয়েছিল, পরে প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন প্রবর্তন করায় এবং বর্জ্যে দানিয়ার শত্রুতায় সমাজ ভেঙে পড়ে। এ সমাজ গঠনে ওয়েন তাঁর নিজের সমস্ত টাকাকড়ি ঢেলেছিলেন, ধূংস পান তিনি। জীবন ক্রমশ দুর্বল হয়ে ওঠে। তাঁর বিশ্ব খ্যাতি ডুবে যায় বিস্মৃতি আর অভাব-অনটনে। কিন্তু তাতেও ভেঙে পড়েন না তিনি। বিত্তবান লোকেদের কাছে তিনি আবেদন জানান, আগেকার মতোই সোৎসাহে তাঁর ভাবনা প্রচার করতে থাকেন, আবেদন ও প্রবন্ধ লেখেন, বক্তৃতা দেন শ্রমিকদের কাছে। সমাজতন্ত্র বিষয়ে তাঁর শেষ ভাষণটা সম্পূর্ণ হতে পারে নি, হল থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে করে। অচিরেই প্রাণবিয়োগ হল এই অসাধারণ মানুষটির, ন্যায্য ও সুখী সমাজব্যবস্থার জন্য যিনি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সারা জীবন।

বিভিন্ন দেশের অধিবাসী অন্যান্য ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের চিন্তাভাবনাতেও চিন্তাকর্ষক অনেককিছু আছে। তবে আগে যা বলা হল তাতেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের প্রবল ও দুর্বল দিকগুলি আলাদা করে দেখলেই কেবল বোঝা যাবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রকৃত মূল্য।

নতুন সমাজের ভবিষ্যদ্বাণী

ন্যায্য ও মানবিক সমাজের যে প্রকল্পগুলি রচিত হয়েছিল এত বিশদে তা সব অকার্যকর ইউটোপীয় হয়ে দাঁড়াল কেন? কারণ সমাজতন্ত্র এবং তাতে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েনের যা চিন্তা, সেগুলি প্রতিভাদীপ্ত হলেও অনুমান মাত্র, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। অনুমান থেকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের তফাৎ এই যে তা সব দিক দিয়ে সুসিদ্ধ, পরীক্ষিত, প্রমাণিত। বিজ্ঞান অনুধাবন করে সত্যকার ঘটনাকে, প্রক্রিয়াকে, অর্থাৎ বাস্তব জীবনকে, আর ইউটোপিয়া নির্ভর করে এক-একজন ব্যক্তির কপোলকল্পনার ওপর। এইটাই তাদের মূলগত পার্থক্য। তাহলে এই প্রশ্ন ওঠে: বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কাছে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র কেন তার ভাবাদর্শীয় বনিয়াদ, যাত্রাবিন্দু? কারণ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র যেসব প্রশ্ন তুলেছে এবং অংশত তার সমাধান দিয়েছে, সেগুলিকেই নেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম* বিষয়ক তত্ত্বের সংরচনে।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের কৃতিত্ব কোনখানে?

প্রথমত, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের কৃতিত্ব হল বুদ্ধিজীবী ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনা, ন্যায্য সমাজব্যবস্থা দিয়ে

* 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' আর 'বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম' বলতে একই কথা বোঝায়: সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পথ এবং ক্রমশ কমিউনিজমে উত্তরণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

তাকে স্থানচ্যুত করার প্রশ্ন উত্থাপন। নিজেদের রচনায় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ব্যাপক প্রচারে সাহায্য করেছেন। তাঁরা সেই জমি তৈরি করে যান যাতে ইতিহাসের দিক থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জনগণের হৃদয়-মন জয় করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দিক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন যা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের স্রষ্টা মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের এই দিকটার খুবই কদর করেছেন তাঁরা। এঙ্গেলস লিখেছেন: 'জার্মান তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র কথানো ভুলবে না যে তা দাঁড়িয়ে আছে সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েনের কাঁধের ওপর, তাঁদের মতবাদের সমস্ত উৎকল্পনা আর ইউটোপীয়তা সত্ত্বেও এই তিনজন মনুষী সর্বকালের মহৎ ধীমানদের অন্যতম, প্রতিভাবে যাঁরা অসংখ্য এমন বহু সত্য আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন, যার সঠিকতা আমরা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করছি।'*

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের এ নির্ণয় সঠিক: লোকেদের অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণ নিহিত উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানায়। তাই থেকে তাঁদের সিদ্ধান্ত: নতুন, ন্যায্য সমাজকে দাঁড়াতে

* Engels F. *The Peasant War in Germany*. — Moscow: Progress Publishers, 1965, p. 22.

হবে উৎপাদনী উপায়ের সামাজিক মালিকানার ওপর। শ্রদ্ধে তাই নয়, একক কেন্দ্রীভূত এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি যে প্রয়োজন সে কথাও বলেছেন সাঁ-সিমোঁ।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা খুবই মন দিয়েছেন শ্রমের প্রশ্নে। পরজীবিতা, পরিশ্রম না করে অন্যের ঘাড় ভেঙে খাওয়ার সমালোচনা করেছেন তাঁরা, বলেছেন যে সমাজে প্রতিটি নাগরিকের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা কর্তব্য হল শ্রম। শ্রমের অদল-বদল যে সম্ভব, শ্রমকে যে সৃজনে, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনে পরিণত করা উচিত, তা নিয়ে তাঁদের চিন্তাও খুব চিত্তাকর্ষক।

বণ্টনের যে প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছেন, সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদের বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় মানুষের জীবনে, তাদের সচ্ছলতা নির্ধারিত হয় তাতে, উৎপাদনের আরো বিকাশ প্রভাবিত হয়। সাঁ-সিমোঁ ও তাঁর অনুগামীরা উপস্থিত করেন বণ্টনের এই ন্যায্য ও মানবিক নীতি: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে (নাও) তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে (দাও) তার শ্রম অনুসারে'। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে এখন এ নীতি বলবৎ।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের অন্যান্য অনেক ভাবনাও স্থান পেয়েছে: নারীর সমাধিকার, শিশুদের সামাজিক লালন-পালন, শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ।

প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ ও সুষম বিকাশের পরিস্থিতি গড়ে তোলা যে আবশ্যিক, এ বিষয়ে তাঁদের চিন্তাও বিশেষ মূল্যবান। একান্ত মানবিক এই ভাবনা

রূপলাভ করেছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে এবং অনুসৃত হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নতুন সমাজ গড়ায় তাদের সাফল্য অনুসারে।

তৃতীয়ত, মানবজাতির জন্য ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের আরো একটা সূক্ষ্মীতি উল্লেখযোগ্য।

সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে আর ওয়েনের মতবাদ হল ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। কিন্তু ভাবনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার প্রচুর ও একাগ্র চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলির অকার্যকরতা জাজবল্যমান রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। যেকোনো তত্ত্বের সঠিকতার বৈজ্ঞানিকতার মানদণ্ড হল প্রয়োগ। সমস্ত সামাজিক মতবাদের ওপর তার রায়ই চুড়ান্ত। সুতরাং ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের প্রকল্পগুলিকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের অসম্ভাব্যতার প্রমাণিত হয় যে সেগুলি বৈঠক, তত্ত্বের দিক থেকে অসিদ্ধ।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র হল তেমন একটা 'ব্যাদি', সমাজ বিকাশের নিয়ম এবং তা পুনর্গঠনের উপায় সম্পর্কে বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক বোধে পেঁছবার জন্য যাতে 'ভুগে উঠতে' হয়েছে মানবজাতিকে। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের অভিজ্ঞতা সামনে না থাকলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে, কেবল ন্যায্যতার প্রচার মারফত বিশ্ব পুনর্গঠনের ইচ্ছা থেকেই যেত লোকেদের। তাঁদের দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে দেখিয়ে দিল যে নবজীবনে যাবার একেবারেই ভিন্ন একটা পথের খোঁজ করতে হবে। সুতরাং ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বিকাশের আবশ্যিক একটা ধাপ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের

জন্মলাভের প্রত্নতিতে তা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। তাই সুখী জীবনে উত্তরণের উপায় সন্ধানের জন্য, কণ্টকিত সে পথে যত দৃঃখকষ্ট তাঁরা বরণ করেছেন, সেজন্য প্রগতিশীল মানুষেরা এই সমাজতন্ত্রী মনীষীদের প্রতি একান্ত সম্মান।

উনিশ শতকে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের ভাবনা কেবল ইউরোপে নয়, অন্যান্য মহাদেশেও প্রচার লাভ করে। যেমন, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে লোকেদের কাছে এসব কথা পৌঁছয়, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তা বেশ প্রভাব ফেলে।

ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া আর আফ্রিকায় ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিকতার ধারণা প্রচারিত হওয়ায় সারা বিশ্বে মার্কসবাদের অনুপ্রবেশ ও প্রসারের জমি তৈরি হয়।

কেন তাঁরা ইউটোপীয়?

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ পেয়েছে কিসে?

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা বৃজ্যোয়া ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সবচেয়ে প্রধান ব্যাপারটাই তাঁরা উদ্ঘাটন করতে পারেন নি, যথা, কী কী নিয়মে পুঞ্জিতান্ত্রিক সমাজ চলছে ও বিকশিত হচ্ছে, কী কী বিরোধ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসে। তাঁরা দেখেছেন কেবল তার প্রকাশটুকু। ব্যাপারটা এইরকম। ধরা যাক আমাদের সামনে এক গভীর নদী। কিন্তু ভেতরে তার

গোপনে বইছে প্রবল স্রোত। সেটা বোঝা যায় কেবল
জলের ওপরকার ফেনিলতা, ঘূর্ণাবর্তে ভাসমান
ডালপাতা দেখে।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা দেখেছিলেন কেবল
পুঞ্জীভবনের উপরিভাগটা। কিন্তু উৎপাদনের বদ্বৈত
পদ্ধতির সত্যকার রূপটি তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেন
নি, দেখতে পান নি সেই বাস্তব শক্তিকে যা পুঞ্জীভবন
বিলুপ্ত করে নতুন, ন্যায্য সমাজ গড়তে সক্ষম।
প্রলোভনীয় তখন সবে রূপ নিচ্ছে, স্বাধীন
রাজনৈতিক গ্রন্থাকলাপে তখনো তা অশ্লীল। তাই
সমাজতন্ত্রীদের কাছে মেহনতিদেবকে মনে হয়েছিল
একটা কষ্টভোগী নিপীড়িত জনপুঞ্জ বলে, যাদের
সাহায্য করা সম্ভব কেবল বাইরে থেকে, আলোকপ্রাপ্ত
এক-একজন মানুষ মারফত। নতুন সমাজের সঠিক পথ,
বৈপ্লবিক সংগ্রাম আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ
ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা খুঁজে পান নি। তাঁদের প্রধান
ভরসা ছিল লোককে বোঝানোর ওপর, নিজেদের ভাবনার
প্রচারে। তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন 'নতুন সমাজের
উপাদানগুলিকে নিজেদের মাথা থেকে বার করতে,
কেননা খোদ পুরনো সমাজটায় এইসব উপাদান তখনো
এমন ভাবে দেখা দেয় নি যাতে সকলের কাছে তা
স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'*

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সঠিক পথ পাওয়া, ভবিষ্যৎ
সমাজের নিয়মসিদ্ধতা আবিষ্কার করা সম্ভব কেবল

* Engels F. *Anti-Dühring*, pp. 314-315.

বুর্জোয়া সমাজের বিরোধগুলি জানা থাকলে। ইউটোপীয়দের পক্ষে সেটা সম্ভব না হওয়ায় অন্যান্য প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রেও কোনো বৈজ্ঞানিক সমাধান দিতে পারেন নি তাঁরা।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার কারণ কী? সেটা নিহিত তখনকার অবজেকটিভ পরিস্থিতির মধ্যেই। তত্ত্ব সর্বদাই কোনো না কোনো ভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহারের প্রতিফলন। সেসময়কার সামাজিক জীবন সমাজতন্ত্রে চলে আসার মতো পরিপক্ব হয়ে ওঠে নি, তাই অনিবার্যতাই তা জন্ম দিয়েছে অপরিপক্ব সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের পর কী সিদ্ধান্ত টানা যায়? কেন এ পরিচয় দরকার?

প্রথমত, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠ ধীমানেরা বহুকাল থেকেই ন্যায়পরায়ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে এসেছেন। স্ৱতরাং বাস্তব সমাজতন্ত্র ইতিহাসের একটা আপাতিক ঘটনা নয়, মানবজাতির বহুকালকার স্বপ্নের রূপায়ণ।

দ্বিতীয়ত, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের জন্ম অপরিণত বুর্জোয়া সম্পর্কাদি থেকে। কিন্তু সমস্ত দেশের ইতিহাসেই তেমন সম্পর্ক দেখা দেয় নি, বর্তমানেও বিকাশের মোটামুটি তেমন একটা ধাপে রয়েছে দেশ ও জাতি কম নয়। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন সব তত্ত্বের দেখা মিলছে যা অনেকটা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের মতামতের মতো। তাই ইউটোপীয়

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জানা থাকলে বর্তমান কালের ভাবাদর্শীয় ধারণাগুলির বাহু-বিচার, আপাতদৃষ্টিতে নতুন কিন্তু আসলে পুরনো, কালবর্জিত তত্ত্বের সঠিক মূল্যায়ন করা সহজ হয়।

তৃতীয়ত, বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে হেয় করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ইতিহাসকে বিকৃত, মিথ্যা করে দেখায়। পুঁজিতন্ত্রের উকিলেরা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিকগুলো নিয়ে তার অপব্যাখ্যা করে এবং সেটাকেই বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বলে চালাতে চায়। যেমন, বুর্জোয়া প্রচারে কমিউনিস্টদের এই বলে গালি দেওয়া হয় যে তারা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে লোকেদের ঘরবাড়ি, বেশভূষা, খাদ্য, চাহিদা, রুচি, আকাঙ্ক্ষা — সবই হবে একরকম। এ সমাজে কারো কোনো ব্যক্তিত্ব থাকবে না, পিঁপড়ের সারির মতো সবাই এক। সমাজতান্ত্রিক সমাজের লোকেদের সম্পর্কে এর চেয়ে ভুল ধারণা আর হতে পারে না। ঠিক বাস্তব সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতেই প্রতিটি মানুষ পায় নিজের সামর্থ্য, প্রবণতা, গুণ বিকাশের, নিজের স্বকীয়তা প্রকাশের ব্যাপক সুযোগ। ঠিক এরই স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রথম সমাজতন্ত্রীরা। এইভাবে, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের জ্ঞান থাকলে ঝেঁটিয়ে দূর করা যায় নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত কুৎসা আর অপপ্রচার যার প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্রের ধারণাটাকেই হেয় করা।

চতুর্থত, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ে যে

কেবল তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের যোগাযোগ
নির্ণয়ে সাহায্য হয় তাই নয়। তাদের নীতিগত পার্থক্য
বোঝাও সহজ হয়। প্রথমটা হল স্বপ্ন, ইউটোপিয়া,
দ্বিতীয়টা — বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা বর্তমানে পৃথিবীর
নানান মহাদেশে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে।

সমাজতন্ত্র ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞানে পরিণত হল
কী উপায়ে? এখন সেই কথাই বলা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রণয়ন

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম উদ্ভবের প্রস্তুতি হয়েছিল পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক মতবাদগুলি দিয়ে। তবে এ তত্ত্ব জন্ম নিয়েছে খোদ সামাজিক বাস্তবতারই দাবি থেকে। কী পরিস্থিতিতে এ বিজ্ঞান দেখা দিল?

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব উদ্ভূত হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। এই সময় নাগাদ পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ পেঁপেছয় উঁচু মাত্রায়। সেইসঙ্গে বেড়ে ওঠে তার অন্তর্নিহিত বিরোধ, বৃদ্ধি পায় ও তীব্র হয় প্রলেতারিয়েত আর বুর্জোয়ার মধ্যে সংগ্রাম। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল নতুন চরিত্র — শ্রমিক শ্রেণী। স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তা আত্মঘোষণা করে ফ্রান্সে লিয়োঁ শ্রমিকদের

অভ্যুত্থানে, ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনে, জার্মানিতে সাইলেন্সিয়ার তাঁতীদের বিক্ষোভে এবং একসারি সামাজিক আলোড়নে। বর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ক্রমেই একরোখা ও সমস্ত দেশব্যাপী চরিত্র ধারণ করতে থাকে। এখন আর এই সংগ্রামের কথা না ভেবে বর্তমানের অধ্যয়ন, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, নতুন সমাজের খসড়া ছকা আর সম্ভব ছিল না। সে পর্বের শ্রমিক আন্দোলন বদল ঘটায় ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বর্জোয়ার দরকার সামাজিক জীবন সম্পর্কে কেবল সেই জ্ঞানটা যাতে মুনোফা আসে, উদ্যোগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়, এবং কয়েম হয় তার শ্রেণী প্রভুত্ব। বর্জোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের তফাৎ এই যে গোটা সমাজজীবনের প্রগাঢ় জ্ঞানলাভে সে আগ্রহী, জানতে চায় তার কর্মনির্বাহ ও বিকাশের নিয়ম। কেন? কারণ তার জীবন সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। সমাজ বিকাশের প্রগতিশীল প্রবণতার বাহক সে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য বৈজ্ঞানিক ষাথার্থ্য তাকে জানতে হবে শুদ্ধ নিজেই নয়। বিনা মোহে, স্থির মস্তিষ্কে তাকে দেখতে হবে বর্জোয়া সমাজকে, বদ্বতে হবে। তবে মানবজাতির বিকাশের সোপানে পুঞ্জিতন্ত্র একটা ধাপ মাত্র। সুতরাং তাকে বদ্বতে, জয় করতে হলে মানবজাতির বিকাশের গোটা ইতিহাসটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।

সমাজ বিকাশের নিয়মগুলির বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য প্রলেতারিয়েতের চাহিদাটা তাই তার অতি গুরুত্বপূর্ণ

একটা চাহিদা। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া সে সাফল্যের সঙ্গে নিজের অবস্থা উন্নয়নের জন্য, নিজের মূলগত স্বার্থ সাধনের জন্য সংগ্রাম করতে পারে না। পরাক্রান্ত একটা অস্ত্র হিশেবে প্রলেতারিয়েতের দরকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তেমন অস্ত্র গড়ে দেন কার্ল মার্কস আর ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। স্বপ্ন থেকে, ইউটোপিয়া থেকে তাঁরা সমাজতন্ত্রকে পরিণত করেন বিজ্ঞানে, এবং তাতে করে সশস্ত্র করেন প্রলেতারিয়েতকে। প্রণয়ন করলেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব।

ইউটোপিয়া থেকে বিজ্ঞান

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ। মানবজাতির ইতিহাস ব্যাখ্যায় মার্কস ও এঙ্গেলসের পূর্ববর্তী সমস্ত মনীষীই ছিলেন ভাববাদী। তাঁরা মনে করতেন: সামাজিক বিকাশের প্রধান শক্তি হল ভাবকল্প, তত্ত্ব, লোকেদের চেতন্য। সুতরাং তাঁদের মতে, সমাজের প্রগতি নির্ধারিত হয় নতুন বিজ্ঞানাদির উদ্ভব, জ্ঞানের প্রচার ইত্যাদি দ্বারা। একদল দার্শনিক বিকাশের নতুন পর্যায়ে মানবজাতির উত্তরণকে সংশ্লিষ্ট করতেন ধর্মের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে, অন্যদল সে পরিবর্তনটা দেখতেন শিল্পকলায়, আরেকদল বিজ্ঞানে। তাঁদের চিন্তাধারা দাঁড়ায় এইরকম:

পরিবেশ, জীবনের পরিস্থিতি থেকে দেখা দেয় ভালো বা মন্দ লোক। তাই মানুষকে উন্নত করতে হলে বদলানো দরকার তার জীবনের অবস্থা। প্রশ্নের এরূপ

উপস্থাপনে অবশ্যই সার না দিয়ে পারা যায় না। কিন্তু পরিবেশের, লোকেদের জীবনাবস্থায় পরিবর্তন ঘটে কী থেকে? ভাববাদীদের ধারণায় সেটা ঘটে এক-একজন লোকের — রাজা, সেনাপতি, আইনপ্রণেতা, চিন্তানায়কের ভাবনাচিন্তা, ইচ্ছা, চেতনা, মানবিকতা, শিক্ষাদীক্ষার কল্যাণে। কিন্তু এইসব লোকে কি নিজেরাই দুনিয়াকে বদলাতে পারে? এইসব অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের আগে কেউ সঠিক, বিজ্ঞানসিদ্ধ উত্তর দিতে পারেন নি।

ইতিহাসের ভাববাদী বোধ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হল যে সমাজকে পরিবর্তিত করা সম্ভব নতুন ভাবধারা, জ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, চিন্তাশীল বিচক্ষণতার সাহায্যে বিদ্যমান ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করতে হবে: উদ্ভাবন করতে হবে একটা নতুন, বেশি সুসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং প্রচার, সম্ভব হলে গঠনমূলক দৃষ্টান্ত দিয়ে তা চালু করতে হবে সমাজে।

সমাজজীবনের উপলব্ধিতে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন ভাববাদী। সেটা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের মতবাদে এবং জীবন পরিবর্তনের যেসব উপায়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁরা, তাতেও। ভাববাদ অনিবার্যতাই পেঁছায় ইউটোপীয় কল্পনায়। সুতরাং সামাজিক বিকাশের বৈঠক ব্যাখ্যা এড়াতে হলে বস্তুবাদে সশস্ত্র হতে হবে। কী তার মূলকথা?

মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন কেবল প্রাকৃতিক ঘটনার ক্ষেত্রেই নয়, প্রধান কথা, সামাজিক জীবনের ঘটনার ক্ষেত্রেও। তার বিশ্লেষণ

করতে গিয়ে তাঁরা ভিত্তি হিশেবে নিয়েছেন জীবনধারণের উপকরণ লাভের প্রণালী বা ধরনকে। খাদ্য, বস্ত্র, পাদুকা উৎপাদন করতে গিয়ে, বাসগৃহ, উদ্যোগ ইত্যাদি নির্মাণ করতে গিয়ে লোকে শ্রমের বিভিন্ন হাতিয়ার, বৈষয়িক ও টেকনিকাল নানা উপায় কাজে লাগায়। শেষ বিচারে, সেগুণের বিকাশ মাত্রাতেই নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট যুগটির স্বকীয়তা। মার্কস মন্তব্য করেছেন, একটা যুগ থেকে আরেকটার পার্থক্য সূচিত হয় কী উৎপাদন করা হচ্ছে তা দিয়ে নয়, শ্রমের কী হাতিয়ার দিয়ে উৎপাদিত হচ্ছে জীবনধারণের উপকরণ, তাই দিয়ে। তার ওপর নির্ভর করে লোকে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্ক, উৎপাদনী সম্পর্কের ব্যবস্থায় প্রবেশ করে। আবার উৎপাদনী সম্পর্ক দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক-শ্রেণীগত কাঠামো, সমাজের আত্মিক জীবনেরও বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ থেকে দেখা গেল: সমাজবিকাশের ভিত্তিতে রয়েছে ভাবকল্প নয়, তত্ত্ব নয়, চৈতন্য নয়, যা ভেবেছিলেন ভাববাদীরা, রয়েছে বৈষয়িক কল্যাণ সৃষ্টির ধরন, যা গঠিত উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্ক নিয়ে। উৎপাদনী শক্তির প্রতিটি মাত্রার অনুযায়ী হতে হবে উৎপাদনী সম্পর্কের চরিত্র, যাতে নির্ধারিত হয় সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ থেকে কী মূলগত সিদ্ধান্ত আসে? বিদ্যমান ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করতে হলে

প্রয়োজন সমাজজীবনের ভিত্তিটাকে, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরনকে, তার ভেতরকার উৎপাদনী সম্পর্কের চরিত্রকে পরিবর্তিত করা। উৎপাদনী শক্তি কি এতটা পরিবর্তিত হয়েছে যাতে উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান নিতে পারে সামাজিক মালিকানা — এ প্রশ্নের উত্তর দেয় আরেকটা বিজ্ঞান — রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্র।

বস্তুবাদী দর্শন সমাজজীবনের সেই ক্ষেত্রটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে যাতে দেখা দেয় নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় উত্তরণের আবশ্যিকতা ও সম্ভাবনা। ভাববাদ থেকে তার তফাৎ এই যে বস্তুবাদ সমাজজীবন পুনর্গঠনের উপায়ের খোঁজ চালিয়েছে সঠিক পথে। এখন কাজ দাঁড়াল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটার — বুদ্ধিজীবী সমাজের উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মূর্ত-নির্দিষ্ট বিশ্লেষণে চলে আসা। প্রয়োজন ছিল ইউটোপীয়দের ধরনে নিজের খুশিমতো সমাজব্যবস্থার ছক আঁকা নয়, যা বিদ্যমান সেটা নিয়েই গবেষণা করা। এ কাজের ভার দর্শন তুলে দিল অর্থশাস্ত্রের হাতে।

ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ আবিষ্কারের মতো এ কাজটাও চমৎকার সম্পন্ন করলেন কার্ল মার্কস। উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীর যে গতি, তার বনিয়াদি নিয়ম আবিষ্কার করলেন তিনি। তাঁর ‘পুঁজি’ গ্রন্থে এই নিয়ম সূত্রবদ্ধ এবং সব দিক থেকে সূর্যসিদ্ধ ও প্রমাণিত করা হয়। এ গ্রন্থকে মার্কস মনে করেছিলেন তাঁর সারা জীবনের সাধনা। মার্কসের জীবৎকালেই তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে, বাকি তিন

খণ্ড প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর, ছাপার জন্য তা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এঙ্গেলস।

বাড়তি মূল্যের নিয়ম আবিষ্কার। বুদ্ধিজীয়া সমাজ বিকাশের বিনিয়াদ নিয়ম হল বাড়তি মূল্যের নিয়ম। মার্কস লিখেছেন, 'বাড়তি মূল্যের উৎপাদন বা মূল্যফা হল এই ধরনের উৎপাদনের অনপেক্ষ নিয়ম।'* তার মধ্যেই অভিব্যক্ত হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মর্মার্থ, বুদ্ধিজীয়া ও প্রলেতারিয়েতের মূলগত স্বার্থের বৈপরীত্য ও আপোসহীনতা।

পুঁজিপতি মজদুর খাটায়। পুঁজিপতিকে শ্রমিক তার শ্রম বিক্রি করছে। ওপর থেকে দেখলে এটা মনে হবে উভয় দিক থেকে সমান অধিকারের একটা ব্যাপার, সামন্ততন্ত্রের মতো কোনো ব্যক্তিগত অধীনতার সম্পর্ক তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই বাহ্যিক সমতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে সুগভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য।

প্রথমত, শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য, নইলে সে বাঁচতে পারে না। কেননা উৎপাদনের যে উপায় ছাড়া শ্রমিকের খাটুনি সম্ভব নয়, সেটা পুঁজিপতির সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, মজদুর-খাটা শ্রমিকের শ্রমদিন দুই অংশে বিভক্ত: প্রয়োজনীয় আর বাড়তি সময়। প্রয়োজনীয় সময়টায় সে যা উৎপাদন করে তার মূল্য তার শ্রমশক্তির সমান। বাড়তি সময়টায় সে

* Marx K. *Capital*. — Moscow: Progress Publishers, 1974, p. 580.

উৎপাদন করে অতিরিক্ত দ্রব্য। তার মূল্যটা তার শ্রমশক্তির যা মূল্য তার ওপর উদ্ভূত। এটা হল বাড়তি মূল্য। কোনো দাম না দিয়ে এই উৎপাদনটা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি, সেটাই হল অতিরিক্ত দ্রব্য বা মুনুফা।

সর্বোচ্চ মুনুফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় পুঁজিপতি শ্রমিকদের শোষণ বাড়িয়ে তোলে। সেটা সে করে নানান উপায়ে। সবচেয়ে সহজ উপায় — কাজের ঘণ্টা বাড়ানো। শ্রমদিন যত বাড়বে, তত বেশি হবে বাড়তি দ্রব্য যা সে আত্মসাৎ করবে। তবে কাজের ঘণ্টা বাড়াবার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে — শ্রমিকের তো দরকার খাওয়া, ঘুমানো, বিশ্রাম ইত্যাদি। আজ যদি সে তার হৃত শক্তি ফিরে না পায়, তাহলে আগামী কাল সে উৎপাদন করবে আগের দিনের চেয়ে কম। তাছাড়া, সামাজিক আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ থেকেই শ্রমিকরা শ্রমদিন সীমাবদ্ধ রাখা ও হ্রাস করার জন্য একরোখা সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র আইন করে সে ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধ্য হয়। সেইজন্য পুঁজিপতিরা সর্বোচ্চ মুনুফা পাবার জন্য বেশি ফলপ্রদ অন্য উপায় কাজে লাগায়। নিয়মিতভাবে শ্রমশক্তির মূল্য কমানোর চেষ্টা করে তারা। এ মূল্য যত কম হবে, একই শ্রমদিনের মধ্যে পুঁজিপতির ভাগে থেকে যাবে তত বেশি।

কিন্তু শ্রমশক্তির দাম কমানো যায় কিভাবে? সেটা করা যায় পণ্যের দাম কমিয়ে, আর পণ্যের দাম কমানো যায় শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত বাড়িয়ে, নতুন টেকনিক ও টেকনোলজি প্রবর্তন করে শ্রমের

প্রখরীভূতির বৃদ্ধি মারফত। তাই নিজের স্বার্থপর লক্ষ্য, বেশি মুনাব্বা পাবার পেছনে ছুটে পুঁজিপতি বাধ্য হয় উৎপাদনকে উন্নত ও বর্ধিত করতে। কী ফল হয় তার?

প্রথমত, শ্রমের ওপর পুঁজির, মেহনতিদের ওপর শোষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমশক্তির চাহিদা কমে, ফলে গড়ে ওঠে শিল্পের মজুদ ভান্ডার — বেকার বাহিনী। পুঁজির জন্য তা প্রয়োজন দৃ'দিক থেকে। উৎপাদন যেহেতু চলে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়, কখনো চড়া, কখনো মন্দার পর্ব দিয়ে, তাই শ্রমশক্তির চাহিদাও বদলায়। মন্দার সময়ে বেকার বাহিনী প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে। আর উৎপাদন যখন চাপা হয়ে উঠে চড়তে থাকে, তখন এ বাহিনী একটু আবশ্যিক মজুদ ভান্ডারের কাজ করে, যা থেকে পাওয়া যায় অতিরিক্ত শ্রমশক্তি। তাছাড়া, বেকার থাকায় কর্মনিবৃত্তদের শোষণ বাড়তে সুবিধা হয় পুঁজিপতিদের, উৎপাদনে নিজের জায়গাটুকু হারাবার ভয়ে ভয়ে থাকে তারা, তাতে করে দুর্বল করা যায় মালিকের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে। অবিরাম অতুৎপাদনের সংকট, মূদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনীতির সামরীকরণ হল উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক ধরন বিকাশের অনিবার্য সহচর।

তবে মার্ক'স এ ধরনের উৎপাদনের কেবল প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলি প্রদর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য প্রগতিশীল প্রবণতাও উদ্ঘাটিত করেছেন। এতে উৎপাদনের পুঁজীভবন, কেন্দ্রীভবন,

শ্রমের সমবায় রূপের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক স্ফূর্তির সচেতন প্রয়োগের মতো প্রক্রিয়াও জোরালো হয়। উৎপাদনীর উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। তা থেকে এই দাবি অদম্য হয়ে ওঠে যে সামাজিক উৎপাদনকে বিকশিত ও পরিচালিত হতে হবে এক-একজন ব্যক্তির নয়, গোটা সমাজের স্বার্থে। কিন্তু সেটা কার্যকৃত হওয়া সম্ভব কেবল উৎপাদনের উপায় যদি হয় গোটা সমাজের সম্পত্তি।

‘পুঞ্জি’ গ্রন্থে মার্কস দেখান কিভাবে বুদ্ধিজীবী সমাজ তার অন্তর্নিহিত নিয়মের ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে পৌঁছচ্ছে তার বিকাশে এবং আত্মনাকচে। সুতরাং সমাজতন্ত্র কতৃক পুঞ্জিতন্ত্রের স্থানগ্রহণ কোনো কোনো ব্যক্তির কপোলকল্পনা নয়, সে প্রয়োজনীয়তা আসছে উৎপাদনের পুঞ্জিতান্ত্রিক পদ্ধতি বিকাশের আঙ্গিক ধারা থেকেই। পুঞ্জিতন্ত্রের এই নিয়মটা আবিষ্কার করে মার্কস অর্থনীতির দিক দিয়ে পুঞ্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যেমন প্রয়োজনীয়তা তেমনি তার সম্ভাব্যতাকেও সুদৃষ্টি করেন।

তবে পুঞ্জিতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য, এ সিদ্ধান্তের অর্থ এই নয় যে তা আপনা থেকেই, স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় ধ্বংস পাবে। তাকে উচ্ছেদের জন্য দরকার বিশেষ একটা সামাজিক শক্তি এবং সে শক্তির সক্রিয় প্রিয়াকলাপ। বিদ্যমান শ্রেণীগুলির মধ্যে সে শক্তি কে? শোষণ, নিঃস্বতা, অধিকারহীনতা দূর করার জন্য কী করা দরকার এবং কিভাবে? নতুন, ন্যায়পরায়ণ সমাজ নির্মাণে এগুতে হবে কোন পথে?

এসব প্রশ্নে উত্তরের জরুরি দাবি করছিল জীবন, মেহনতি জনগণের সংগ্রাম। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র তার উত্তর দিতে পারে নি। ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ আর বাড়তি মূল্যের নিয়ম অবলম্বন করে এইসব সমস্যার বিজ্ঞানসিদ্ধ সমাধান দেন মার্কস ও এঙ্গেলস। এতে করে তাঁরা সমাজতন্ত্রের মতবাদকে পরিণত করেন স্বপ্ন থেকে বিজ্ঞানে যা পরে সমর্থিত হয়েছে বাস্তব জীবনে।

নতুন সমাজ নির্মাণ করতে হবে কিভাবে?

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন: প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক পদ্ধতি বিকাশের একটা নিয়মানুগ পরিণাম। পুঁজিতন্ত্রের মূল বিরোধ হল উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ, মেহনতিদের অবস্থার ওপর তার প্রভাব চূড়ান্ত নেতিবাচক।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি, উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বেড়ে উঠছে মেহনতিদের চাহিদা। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনের জন্য যা প্রয়োজন, সে পরিমাণে চাহিদাটা মিটছে না। মেহনতিদের চাহিদা আর তা মিটবার মাত্রার মধ্যে ব্যবধানের কারণ উৎপাদনী উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব। এ উপায়ের মালিক পুঁজিপতি বাড়তি মূল্য কাজে লাগায় শ্রমিকদের স্বার্থে নয়, নিজের অর্থগৃধ্র স্বার্থে।

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তাদের রাজনৈতিক পরিপক্বতা। সংখ্যায় তারা

ক্রমাগত বেড়ে উঠছে, শিক্ষিত, মিলিত আর সংগঠিত হয়ে উঠছে সর্বত্র পুঞ্জিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার যন্ত্রপ্রক্রিয়ার ফলেই। সুতরাং নিজেদের অবজেকটিভ অবস্থার দরুনই এই হল একমাত্র শ্রেণী যা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা সমাজ পুনর্গঠনের সমস্ত ভরসা রেখেছিলেন এক-একজন মহাপুরুষের ওপর। মার্কস আর এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দেখলেন সেই একমাত্র বাস্তব শক্তিকে যা পুঞ্জিতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত করতে পারে সমাজতন্ত্রকে। বর্জোয়া ব্যবস্থার সমাধিখনক হিশেবে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক রতের প্রতিপাদন হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা মীমাংসা।

এবার কাজ দাঁড়াল তার প্রিয়াকলাপের কর্মসূচি বৈজ্ঞানিকভাবে সূচিস্ব কর, সামাজিক পীড়ন থেকে নিজের এবং সমস্ত মেহনতির মুক্তির জন্য কী তাকে করতে হবে এবং কিভাবে, সেটা দেখানো। মার্কস ও এঙ্গেলস লিখলেন: ‘বর্তমান মূহুর্তে’ কোনো কোনো প্রলেতারিয়ান, অথবা এমনকি সমগ্র প্রলেতারিয়েত নিজেদের লক্ষ্য বলে কী দেখছে, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। প্রলেতারিয়েত আসলে কী এবং নিজের অস্তিত্ব অনুসারে, ঐতিহাসিকভাবে কী করতে সে বাধ্য হবে, সেইটে হল কথা।’*

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব এইসব প্রশ্নের জবাব

* Marx K., Engels F. *Collected Works*. — Moscow: Progress Publishers, 1975, p. 37.

দেয়। তা উদ্ঘাটিত করে সমস্ত নিপীড়িত মানুষের মর্দুস্তির পথ, দেখায় শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মসঙ্গতি, যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গেছে ন্যায্য সমাজ নির্মাণে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে এঙ্গেলস লিখেছেন: ‘তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং সেইসঙ্গে এই বিপ্লবটারই প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা এবং তাতে করে এই কীর্তি সাধনে আহত যে শ্রেণীটি বর্তমানে নিপীড়িত, তাকে তার নিজস্ব কাজের শর্ত ও প্রকৃতি বোঝানো — এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিরূপ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।’*

প্রলেতারিয়েত সচেতনভাবে সংগঠিত হয়, নিজেদের রাজনৈতিক পার্টি গড়ে, তার পরিচালনায় শুরুর করে সমাজে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। শ্রেণী সংগ্রামের প্রধান প্রশ্নই হল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবের গতিপথে সমাজে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে মেহনতিরা তাকে কাজে লাগায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য সাধনের উপায় হিশেবে। এবার কথাটা মেহনতিদের স্বার্থে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রের সচেতন, উদ্দেশ্যমূলক পুনর্গঠন নিয়ে।

তাই বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন আর সমাজতন্ত্রের নীতিতে তার ভবিষ্যৎ বিকাশ নিয়ে সচেতন ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব। তা গবেষণা

* Marx K., Engels F. *Selected Works* in three volumes. — Moscow: Progress Publishers, 1970, Vol. 3, p. 151.

করে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রস্তুতি, উদ্ভব আর বিকাশের প্রক্রিয়া নিয়ে, যা কার্যকৃত হয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে অন্যান্য মেহনতিদের সহযোগে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল মার্কসীয় দর্শন ও অর্থশাস্ত্রের যুক্তিসঙ্গত অনুবর্তন ও সম্পূর্ণীকরণ। তার সৃজন সম্ভব হয়েছে এই বিজ্ঞানদৃষ্টির বনিয়াদি আবিষ্কারের ভিত্তিতে যথা: ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধ আর বাড়তি মূল্যের নিয়ম। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অন্যান্য ধারণাও কম নেই, সেগুনি নীতিশাস্ত্রীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ইত্যাদি চরিত্র পরিগ্রহ করে। কিন্তু সবই তা সমাজজীবনের ভাববাদী ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থনৈতিক সুদৃষ্টি কারো নেই। তাই প্রথম দৃষ্টিতে সেগুনি যতই আকর্ষণীয় ঠেকুক সেগুনি অবৈজ্ঞানিক, ইউটোপীয়।

সত্যকার সামাজিক বিজ্ঞানের কর্তব্য কেবল বিশ্বের ব্যাখ্যাতেই পর্যবসিত নয়। প্রধান কথাটা হল মানুষের স্বার্থে বাস্তবকে বদলানো। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে এ কাজটা সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গারে সাধিত হয়েছে। সেইজন্যই লেনিন তাকে বলেছেন 'বিশ্বের সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মসূচি'।* যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দর্শন আর অর্থনীতির দিক দিয়ে সুদৃষ্টি, সমস্ত দেশের মেহনতিদের সংগ্রাম ও সৃজনকর্মের হিসাব রাখে ও তার সাধারণীকরণ কাজে

* Lenin V. I. *Collected Works*. — Moscow: Progress Publishers, 1977, Vol. 21, p. 50.

লাগায়, কেবল তা-ই হতে পারে তাদের ব্যবহারিক
ক্রিয়াকলাপের চালিকা।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তাই শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক
অর্থনৈতিক স্বার্থের তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। নিজেদের
আত্মমুক্তির কর্তব্য সাধনের জন্য মেহনতিদের শৃঙ্খল
ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হতে হবে তাই নয়, নিজেদের
অগ্রবাহিনী পার্টির নেতৃত্বে আয়ত্ত করতে হবে এই
পরাক্রান্ত তাত্ত্বিক হাতিয়ারটিকেও।

যেকোনো দেশে মার্কসবাদের প্রচার বুর্জোয়া ও
পেটি-বুর্জোয়া মতবাদের স্বয়ংস্ব নোড়নের সঙ্গে
নিবিড়ভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তার
জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। যেমন রাশিয়ায় উনিশ শতকের
শেষে এমন মতবাদ ছিল যা বলত যে দেশটা একেবারেই
পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মতো নয়, মার্কসবাদী
তত্ত্ব এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না। এইসব তত্ত্বের সঙ্গে
বিতর্কে লেনিন দেখান: নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও
রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির মতো
পুঁজিতান্ত্রিক পথেই চলেছে। সুতরাং মার্কস ও
এঙ্গেলসের মতবাদ রাশিয়ার ক্ষেত্রেও পুরোপুরি
প্রযোজ্য। বাস্তব জীবন পুরোপুরি সমর্থন করেছে
লেনিনের সিদ্ধান্ত।

অনুরূপ ছবি আমরা দেখি অন্যান্য অঞ্চলেও।
দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এ
শতকের ২০-এর দশক থেকে এমন ধারণা ছড়াতে থাকে
যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এ মহাদেশে প্রযোজ্য নয়।
লাতিন আমেরিকার মার্কসবাদীরা, সর্বাগ্রে

হ. ক. মারিআতেগি. (পেরু), হ. আ. মেলিয়া (কিউবা) এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ভ্রান্তি দেখিয়ে দেন এবং এ অঞ্চলের দেশগুলিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রযোজ্যতা প্রমাণিত করেন।

আমাদের কালের ঘটনাবলি দেখাচ্ছে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রচার লাভ করছে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ব্যাপক প্রচারের প্রধান কারণ হল অবজেকটিভ প্রক্রিয়াগুলিকে তা সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত করে এবং মেহনতি জনগণের চাহিদা ও স্বার্থ প্রকাশ করে সুগভীর রূপে, তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের তা কম্পাস।

সরাসরি বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের তত্ত্ব হিশেবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বিকশিত হচ্ছে মেহনতি জনগণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। তার গবেষণার বিষয়বস্তুও একই থাকছে না। ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে তা, যেমন এক-একটা দেশের চৌহদ্দির মধ্যে, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজজীবনের নতুন নতুন দিক ও ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাতে।

আন্তর্জাতিক মতবাদ

তাত্ত্বিক রূপে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম প্রকাশ করে প্রলেতারিয়েতের অবস্থা, প্রয়োজন, লক্ষ্য আর সংগ্রাম। সেইসঙ্গে তাতে প্রতিফলিত হয় সমস্ত মেহনতিদেরও

স্বার্থ, কেননা তা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ও আদর্শের সঙ্গে মেলে।

প্রকৃতিগতভাবেই শ্রমিক শ্রেণী প্রগাঢ় আন্তর্জাতিক। উৎপাদনী শক্তি বিকাশের তেমন একটা পর্যায়ের সঙ্গে তারা জড়িত, যখন ইতিহাসে তারাই একটা আন্তর্জাতিক, আন্তর্দেশীয় চরিত্র লাভ করে। সেই কারণে তার সবকিছুতেই, সংগ্রাম, বিপ্লব, নতুন সমাজ নির্মাণে দেখা দেয় একটা আন্তর্জাতিক একাত্মতা। প্রলেতারিয়েতের বিপরীতে বৃজোয়ারা মূলত জাতিবাদী।

বৃজোয়ার সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের পার্থক্য এই যে তারা লড়ে ও জয়লাভ করে আন্তর্জাতিকতার পতাকা নিয়ে। সেইসঙ্গে তারা ভুয়া নয়, সত্যকার জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায়, কেননা এ স্বাধীনতা প্রগাঢ় আন্তর্জাতিক সহমিতালির ভিত্তি। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা অঙ্গাঙ্গিরূপে মিলিত তার সমুদ্র বৈপ্লবিকতার সঙ্গে, যেটা প্রকাশ পায় যেকোনো রকমের সামাজিক ও জাতীয় পীড়ন উচ্ছেদে, বিশ্বের বৈপ্লবিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় সমস্ত জাতির মধ্যে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায়।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের চরিত্রও আন্তর্জাতিক। সেটা প্রকাশ পায় এই ব্যাপারে যে সে তত্ত্ব কেবল একটা নয়, সমস্ত দেশ ও জাতির যে অভিজ্ঞতা, তার সাধারণীকরণ করে। এঙ্গেলস লিখেছেন, 'কমিউনিজম ইংরেজ বা অন্য কোনো জাতির বিশেষ অবস্থার পরিণাম ফল নয়, এ একটা অপরিহার্য সিদ্ধান্ত যা আসছে

বর্তমান সভ্যতার সাধারণ পরিস্থিতিতে নিহিত পূর্বশর্ত থেকে।* কমিউনিস্টবিরোধী ও শোধানবাদীরা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের আন্তর্জাতিক চরিত্র অস্বীকার করে, চেষ্টা করে তত্ত্ব, রাজনীতি ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে জাতিবাদ চালাতে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের জাতিবাদী অপব্যাখ্যা দেওয়া, মেহনতিদের ভাবাদর্শীয় ও রাজনৈতিক তত্ত্ব ফাটল ধরানো। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বকে বিভিন্ন জাতীয় রূপভেদে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তারা বৈপ্লবিক তত্ত্বের মূলনীতিগগুলির কদর্থ করে। মর্মার্থের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম সমস্ত মেহনতিজনের সম্পদ।

নিজেদের মুক্তিসাধক ভূমিকা শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলি পালন করতে পারে কেবল আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ফলে। কমিউনিস্টরা কার্যক্ষেত্রে ও তত্ত্বের দিক থেকে দেখাচ্ছে তাদের ঐক্য, এ পথে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে ক্রমেই অর্জন করছে বৃহৎ সাফল্য। কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রস্তুতি, উদ্ভব ও বিকাশের নিয়মবদ্ধতা নিয়ে গবেষণারত একটা বিজ্ঞান হিসেবে তার বিষয়বস্তু থেকেই আসছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সৃজনধর্মী মর্মার্থ। এ তত্ত্বের সামাজিক কাজ হল বিশ্ব পুনর্গঠনে মেহনতিদের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের পথ পাতা।

* Marx K., Engels F. *Collected Works*, 1975, Vol. 3, p. 392.

বৈপ্লবিক সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণ — এ হল অবিরাম প্রসারমাণ গতিশীল একটি প্রক্রিয়া। বিশ্বের কমিউনিস্ট চরিত্রের নবায়নে যত সাফল্য লাভ হয়, ততই দেখা দেয় নতুন নতুন সমস্যা, তা সমাধানের নতুন নতুন সম্ভাবনা ও রূপ। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বাস্তব জীবনের সুগভীর ও সর্বাঙ্গীণ গবেষণার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বকে অবিরাম সমৃদ্ধ ও বিকশিত হতে হবে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম পরস্পর সম্পর্কিত দু'টি কর্তব্য পালন করে। প্রথমটা হল বিশ্ব পুনর্গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া আর ঘটনাদির জটিল সমষ্টির মধ্যে থেকে সেই নিয়মবদ্ধতাগুলিকে বেছে নেওয়া যা সমস্ত দেশেই বলবৎ। তাদের গবেষণাই সর্বদা থেকেছে মার্কসবাদী পণ্ডিতদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে। বর্তমানে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন বৈপ্লবিক সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের এমন সব নিয়মবদ্ধতার জ্ঞানে সশস্ত্র যা তত্ত্বের দিক থেকে সুসিদ্ধ, ব্যবহারে পরীক্ষিত। সেগুলি যে কমিউনিস্টবিরোধী ও শোধানবাদীদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, সেটা অকারণে নয়।

দ্বিতীয়টা হল প্রতিটি অঞ্চল ও প্রতিটি দেশে তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে এই সাধারণ নিয়মগুলি প্রয়োগ করা। 'একই আন্তর্জাতিক কর্তব্য সাধনের দিকে প্রতিটি দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট অভিজ্ঞমনের মধ্যে যা জাতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক, জাতীয় স্বাভাব্যসূচক, সেটাকে অনুধাবন করা, অধ্যয়ন করা, খোঁজা, আবিষ্কার করা,

চেপে ধরা,* — কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এই কর্তব্য নির্দিষ্ট করেছেন লেনিন। তাঁর এই নির্দেশ বর্তমানে সমর্থিত হচ্ছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে এ কর্তব্য পালিত হচ্ছে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আর সমাজতন্ত্র নির্মাণের যে অভিজ্ঞতা তার সাধারণীকরণের ভিত্তিতে। এ ব্যাপারে মার্কসবাদীরা সংগ্রাম চালায় দুই ফ্রণ্টে: সাধারণ নিয়মগুলি সম্পর্কে মতাদ্বাদ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যাতে তার সৃজনধর্মী প্রয়োগের স্থান নেই, এবং শোষণবাদীদের বিরুদ্ধে যারা সাধারণ নিয়মগুলির মর্ম ও বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে।

বিশ্বের বৈপ্লবিক নবায়নের হাতিয়ার

আমাদের যে যুগ, শোষণ ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই যুগে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের ভূমিকা দ্রুতগতি বেড়ে উঠছে। এই পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তার প্রসার ও জটিলতা এমনই যে তা কার্যকর হতে পারে কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধ সত্ত্বেও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া যে আরো বিস্তৃত ও প্রগাঢ় হচ্ছে, বিশ্বই তার সাক্ষ্য। বিশ্ব পরিসরে সমাজতন্ত্র তার অবস্থান জয় করে নিচ্ছে দ্রুতগতি বিস্তৃতাকারে,

* Lenin V. I. *Collected Works*, 1982, Vol. 31, p. 92.

কার্যক্ষেত্রে তা রূপায়ণের এলাকা প্রসারিত হচ্ছে অবিরাম।

উন্নত 'পুঞ্জিতান্ত্রিক' দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণী একরোখা শ্রেণীসংগ্রাম চালাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অধিষ্ঠানপীঠেই। পরিবর্তিত হচ্ছে এ সংগ্রামের পরিস্থিতি, সুতরাং প্রয়োজন হচ্ছে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নতুন নতুন রূপ নিয়েও গবেষণা।

ঔপনিবেশিকতার জোয়াল থেকে মুক্ত জাতিগুলির সংগ্রাম প্রখন উঠেছে গুরুগতভাবে নতুন একটা ধাপে। তাদের সামনে খুলে যাচ্ছে যুগ যুগের পশ্চাৎপদতা দূর করার, সত্যকার স্বাধীনতা ও সামাজিক মুক্তি অর্জনের নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা।

উল্লিখিত এইসব এবং অন্যান্য সমস্যাদির সঠিক সমাধান দিতে পারাই হল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বের সামাজিক কাজ।

সমাজজীবনের সমস্ত দিকের আমূল পরিবর্তন বোঝায় যে নতুন ব্যবস্থায়, তা গড়তে পারে কেবল খোদ মেহনতিরাই। বর্তমানে সমস্ত মহাদেশেই বিপুল সংখ্যক লোক যোগ দিচ্ছে বিশ্ব পুনর্গঠনে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া ততই সাফল্যের সঙ্গে চলবে, যত সে বিষয়ে সচেতন থাকবে তাতে যোগদানকারীরা, যত ফলপ্রদরূপে গণ আন্দোলনের সঙ্গে মিলবে বৈপ্লবিক তত্ত্ব।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তাই কেবল যে জটিল সামাজিক ঘটনা বুঝতেই লোককে সাহায্য করে তাই নয়, মানুষের সবচেয়ে মানবিক আদর্শ, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের বাস্তব পথও দেখায়। তাই

এ তত্ত্বের প্রগাঢ় আয়ত্তি হল সত্যকার ন্যায্য সমাজের জন্য সচেতন ও সক্রিয় যোদ্ধা গড়ে তোলার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা উপায়। এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন, 'সমাজতন্ত্র যবে থেকে বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন থেকে তার দাবি তার সঙ্গে যেন ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানের মতো, অর্থাৎ তাকে যেন বিচার করা হয়।'* একথা বলা হয়েছিল শতাব্দিক বছর আগে। কিন্তু বর্তমানের মতো এটা এত সমকালীন আর প্রাসঙ্গিক বলে আর কখনো শোনায় নি। বহু লোকের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে: মানুষ যদি চায় আমাদের জটিল এই সময়টার ঘটনাবলির মধ্যে হৃদিশ পেতে, বিশ্বের ন্যায্য পুনর্গঠনের সংগ্রামে যোগ দিতে এবং তাতে করে একটা চিত্তাকর্ষক, সারগর্ভ জীবন যাপন করতে, তাহলে তাকে ভালো করে জানতে হবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে অধ্যয়ন করতে হবে কিভাবে?

সর্বাপ্রাে নিজের কাছে পরিষ্কার করে নিতে হবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের সামাজিক লক্ষ্যটা কী। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল পূর্বনোর বৈপ্লবিক পুনর্গঠন করে নতুন সমাজ গঠনের তত্ত্ব ও কর্মসূচি যা ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অধ্যয়নে ধরে

* Engels F. *The Peasant War in Germany*, p. 23.

নেওয়া হয় মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনাদি নিয়ে অবিরাম চর্চা, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির দলিলাদি বিচার, যাতে যৌথ প্রয়াসে বিকশিত হচ্ছে এই বিজ্ঞান।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল মার্কসবাদী দর্শন ও অর্থশাস্ত্রের যুক্তিযুক্ত অনুবর্তন ও সম্পূর্ণীকরণ। তাই সেটা আয়ত্ত করতে হলে এ দুটি বিজ্ঞানের বেশ খানিকটা পরিচয় থাকা দরকার।

চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সম্ভব যদি কেবল তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অন্যান্য ধারা তথা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও তার আধুনিক রূপাদির সঙ্গে তার তুলনা করা যায়।

পঞ্চমত, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ওপর দখল থাকা বলতে বোঝায় তাকে জ্ঞানের একটা অখণ্ড তন্ত্র হিশেবে আয়ত্ত করা যাতে তার সমস্ত তত্ত্ব, থিসিস, বর্ণভেদগুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত।

এবার এ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আরো বিশদ পরিচয়ে আসা যাক। দেখব তা বর্তমান কালের সামাজিক সমস্যাগুলির কী সমাধান দিচ্ছে এবং কিভাবে সে সমাধান বাস্তবে কার্যকৃত হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমান যুগের মূলগত চরিত্র বা অন্তঃসার

প্রতিটি নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম কষ্টসাধ্য ও জটিল। সমাজতন্ত্র যেহেতু সমস্ত পূর্ববর্তী ব্যবস্থা থেকে নীতিগতভাবে পৃথক, তাই তার রূপলাভের চরিত্রটাও স্বকীয় ধরনের। এ প্রক্রিয়া চলে কেবল এক-একটা দেশ বা দেশগোষ্ঠীর মধ্যে নয়, গ্রহণ করে তা আন্তর্জাতিক চরিত্র।

বর্তমান যুগ অসাধারণ জটিল ও বিরোধগর্ভ, তার মধ্যে পড়ে অতি বিভিন্ন রকম সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় ১৫০টি রাষ্ট্র। তাদের একদল যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথ ধরে, অন্য দল রয়েছে পুঁজিতন্ত্রের পর্যায়ে, অবিরাম ভুগছে সংকট আর ঝাঁকুনিতে, তৃতীয় দলে এখনো সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রভুত্ব। আধা-সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও বাস

করছে কম জনগোষ্ঠী নয়। মানবজাতির বহু যুগের ইতিহাসে যত সমাজব্যবস্থার কথা জানা আছে, তাদের বেশির ভাগই টিকে থাকছে একই সময়ে। রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীগুলির বিকাশে এত মাত্রাভেদ পূর্ববর্তী কোনো প্রজন্মেই আর দেখা যায় নি।

তবে এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমাদের দুনিয়াটা একক। কোনো একটা জনগোষ্ঠী বিকাশের যে মাত্রাতেই থাকুক, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা দিন কাটায় না। হাজার হাজার সূত্রে এক দেশের জীবন অন্যদের জীবনের সঙ্গে গাঁথা। গ্রহের এক অংশের ঘটনাবলি অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের জীবনেও কোনো না কোনো ভাবে প্রতিফলিত হয়। একালের কোনো একটা ঘটনাও এখন আর স্থানীয় চরিত্র ধরে না। এদিক থেকে প্রধান বিপদ হল সামরিক সংঘর্ষ: যেখানেই তা শুরুর হোক, বিশ্ব দাবদাহে তা পরিণত হবার বাস্তব বিপদ থেকে যায়। অশ্বের যে বল্গাহীন প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্যবাদীরা উশকিয়ে তুলছে, তাতে শুধু এক-একটা জাতির নয়, সমগ্র মানবজাতিরই জীবন বিপন্ন।

বর্তমান বিশ্বের এই অখণ্ডতা ঐতিহাসিক বিকাশের ফল। আমাদের সমকালীনদের অনেকেই এই অখণ্ডতাটা স্বীকার করেন, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের উৎকণ্ঠায়, তার অস্তিত্ব বিপন্ন করছে যে শক্তি, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

আমাদের কালের এককতা মূর্ত-নির্দিষ্ট রূপে প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক কিসে? তার কোন কোন দিক ইতিহাসের বিগত পর্বগুলি থেকে পৃথক? আমাদের যুগ এমন

অদ্বিতীয় হয়ে উঠছে কী কারণে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে দেখা যাক 'যুগ' বলতে কী বোঝায়।

যুগ জিনিসটা কী?

মানবজাতির গোটা ইতিহাসকে বড়ো বড়ো কতকগুলি পর্বে ভাগ করা যায়, যা যুদ্ধ, বিপ্লব, নতুন শ্রেণীর ক্ষমতা লাভ ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ ঘটনার চিহ্নিত। এমন প্রতিটি পর্ব তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে পৃথক, তার থাকে একটা নিজস্ব অনন্য চেহারা। বিশ্ব ইতিহাসের এই ধরনের পর্বকেই বলা হয় ঐতিহাসিক যুগ। মানবজাতির গোটা ইতিহাস হল এক থেকে অন্য যুগে ধারাবাহিক পরিবর্তন।

একটা থেকে অন্য যুগটার তফাৎ ঠিক কিসে, এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যুগে যুগে বিভক্ত হচ্ছে কেন? কিছু কিছু মনীষী মনে করেন যে একটা যুগ থেকে অন্যটার পার্থক্য শিল্প বিকাশের মাত্রা আর চেহারা, অন্য দল ভাবেন সেটা কোনো একটা ধর্মমতের জায়গায় অন্যটার উদয় ও প্রচারে, আবার কেউ কেউ বলেন যে সেটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর কৃতিত্বে চিহ্নিত।

স্মরণ করা যাক যে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ছিল এই রকমেরই কিছু একটা ধারণা। এটা ভাববাদ। শুধু সে ক্ষেত্রে সেটা দেখা দিয়েছে একটি সমাজের বিকাশ সম্পর্কে বোধে, এক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি ব্যাখ্যায়। সমাজজীবনের বিশ্লেষণে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির অবৈজ্ঞানিকতা পুনরায় দেখাবার প্রয়োজন নেই।

অবশ্যই আমাদের যুগ শিল্পকলার বিকাশমাত্রা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের পর্যায়, বিজ্ঞান ও টেকনিকে মূলগত আবিষ্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি — সবদিক দিয়েই পূর্ববর্তী যুগগুলি থেকে পৃথক। কিন্তু যুগগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য এটাই নয়। সেটাকে খুঁজতে হবে আরো গভীরে, সমাজজীবনের মূলে, বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরনে। এই দিক থেকে বিদ্যমান সমস্ত দেশ ও রাষ্ট্র কয়েকটি গ্রুপে — বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভক্ত: কমিউনিস্টধর্মী, পুঁজিতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ইত্যাদি।

এক-একটা দেশ অন্যদের থেকে পৃথক নানা দিক দিয়ে: ঐতিহাসিক অতীত, প্রাকৃতিক অবস্থা, জাতীয় সংবিন্যাস। কিন্তু উৎপাদনের কোন ধরন বা প্রণালীতে নির্দিষ্ট সমাজটির উৎপাদন নির্ধারিত, কাদের হাতে রয়েছে উৎপাদনের উপায়, সেটা জানা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তখন, দৃষ্টান্তস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন আর কিউবার মতো দেশের একেবারে সাদৃশ্য নেই বলে মনে হলেও তাদের ধরতে হবে একই সারিতে — কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বলে। আবার উলটোটাও ঘটে: অতীতের একই জাতি বোঝাতে পারে দুই রকম ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক জার্মানি কমিউনিস্ট, পশ্চিম জার্মানি পুঁজিতান্ত্রিক।

প্রতিটি সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি হল উৎপাদনের নির্দিষ্ট একটা ধরন, উৎপাদনের প্রতিটি ধরনের পেছনে থাকে নির্দিষ্ট শ্রেণী — সামন্ত, বার্জোয়া, শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক। প্রতিটি ব্যবস্থার পেছনে যেহেতু থাকে নির্দিষ্ট

শ্রেণী, তাই কোনো একটা যুগের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে দেখানো প্রয়োজন কোন শ্রেণীর হাতে রয়েছে ক্ষমতা, কে অধিপতি। লেনিন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নির্দিষ্ট যুগটার এক-একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন কত দ্রুত এবং কী সাফল্যে অব্যাহত হতে থাকবে সেটা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কোনো একটা যুগের কেন্দ্র রয়েছে কোন শ্রেণী, তার সারার্থ, বিকাশের প্রধান ধারা, যুগটির ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আমরা জানতে পারি এবং জানব।'* কোনো একটা যুগের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, বর্তমান যুগের সারার্থ উদ্ঘাটনে সাহায্য করে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব।

ঐতিহাসিক যুগের বিশ্লেষণ হল কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশল নির্ণয়ের যাত্রাবিন্দু। লেনিন এই কথায় জোর দিয়েছেন: 'কেবল এই ভিত্তিতে, অর্থাৎ সর্বাগ্রে বিভিন্ন 'যুগের' (এক-একটা দেশের ইতিহাস থেকে আলাদা আলাদা ঘটনা নিয়ে নয়) মূলগত দিকগুলি বিচার করে আমরা সঠিক রণকৌশল স্থির করতে পারি; নির্দিষ্ট যুগটির মূলগত দিকগুলির জ্ঞানই কেবল হতে পারে কোনো একটা দেশের আরো বিশদ বৈশিষ্ট্যগুলি খতিয়ানের ভিত্তি।'**

সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ণয়ে নির্দিষ্ট যুগটির চরিত্র

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 21, p. 145.

** Ibid.,» p. 149.

সম্পর্কে নিভুল জ্ঞান থাকার ভূমিকা কী বিপুল। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন এই সমস্যাটায় অত্যন্ত গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। তার গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পায় বিশ শতকের গোড়ায়। ঠিক এই সময়েই লেনিন আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালের পর্ব বিভাগ করেন। নিম্নোক্ত যুগগুলিকে পৃথক করেছেন তিনি:

প্রথম যুগ — মহান ফরাসি বিপ্লব থেকে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ ও প্যারিস কমিউন (১৭৮৯-১৮৭১)। এটা হল বর্জোয়ার উত্থান, তার পরিপূর্ণ বিজয়ের যুগ। এই পর্বে বর্জোয়া সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়, যাতে যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণীও।

দ্বিতীয় যুগ — বর্জোয়ার পরিপূর্ণ প্রভুত্ব ও অবক্ষয়, সাম্রাজ্যবাদে উৎক্রমণের যুগ (১৮৭১-১৯১৭)। এই সময়ে চলে বর্জোয়ার সঙ্গে নির্ধারক সংঘর্ষের জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রস্থিতি ও শক্তি সঞ্চার। লেনিন লিখেছেন, 'উদীয়মান অগ্রণী শ্রেণী থেকে বর্জোয়া পরিণত হল নিম্নমুখী, অবক্ষয়ী, ভেতরে ভেতরে মরে-যাওয়া, প্রতিক্রিয়াশীল। ব্যাপক ঐতিহাসিক পরিসরে উদীয়মান হয়ে দাঁড়াল একেবারেই অন্য শ্রেণী।'* নতুন যুগে প্রয়োজন হল প্রলেতারিয়েতের আচরণ ও সংগ্রামের নতুন রাজনৈতিক ধারা রচনা, ঝঞ্ঝাক্রমে পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস করতে যা সক্ষম তেমন নতুন ধরনের পার্টি গঠন।

তৃতীয় যুগ — পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ—

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 21, p. 149.

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব দিয়ে তার শুরুর।

লেনিন লেখেন, ‘...এজন্য গর্ব করার অধিকার আমাদের আছে এবং গর্ব বোধই করি যে সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠন শুরুর করার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের, তাতে ক’রে বিশ্ব ইতিহাসের একটা নতুন যুগ শুরুর করার, যেটা নতুন শ্রেণীর প্রভুত্বের যুগ, যারা সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে নিপীড়িত এবং সর্বত্রই এগোচ্ছে নবজীবনের দিকে, বর্জুয়োর ওপর বিজয় লাভের দিকে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের দিকে, পুঁজির জোয়াল থেকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে মানবজাতির মুক্তির দিকে।’*

তাই যুগ হল বিশ্ব ইতিহাসের বড়ো বড়ো পর্ব, যা একই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশে মূলগত পর্যায়ের সঙ্গে অথবা ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত এবং বড়ো বড়ো ঘটনা দিয়ে সীমার্চিত।

প্রথম দুটি যুগ সংশ্লিষ্ট একই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে। তৃতীয় যুগটি নীতিগতভাবেই অন্যবিধ — তাতে কার্যকৃত হচ্ছে শোষক সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরণ নতুন কমিউনিস্ট ব্যবস্থায়, যেখানে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ নেই, যেখানে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রয়াস হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমাজের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

যুগের সঠিক নির্ণয় যে বৃহৎ তাৎপর্য ধরে, সেটা

* Lenin V. I. *Collected Works*, 1973, Vol. 33, p. 55.

কেবল কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশল রচনার ক্ষেত্রেই নয়। প্রতিটি ব্যক্তির সঠিক বিশ্ববীক্ষা, দিশা, জীবনের লক্ষ্য নিরূপণেও তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বিসের মধ্যে সত্যিই মূর্ত হয়েছে আধুনিক কাল, ভবিষ্যৎ কার পক্ষে — সংকট, সামরীকরণ, মেহনতিদের পীড়ন নিয়ে পুঞ্জিতন্ত্র নাকি সমাজতন্ত্রের পক্ষে যার পতাকায় মূদ্রিত: ‘সবকিছু মানুষের নামে, সবকিছু মানুষের জন্য?’ পুঞ্জিতন্ত্র লোককে করে তোলে নৈরাশ্যবাদী, ভবিষ্যতে ভীত, আটকে রাখে তার শক্তির স্ফুরণ, করে তোলে ভৌতশক্তির অন্ধ শিকার। সমাজতন্ত্র জাগায় নিশ্চয়তা, আশাবাদ, লোককে ভাবায়, মানুষের জীবন উন্নয়নের জন্য, যুদ্ধ, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ, বেকারি, দারিদ্র্যের মতো পৈশাচিক ব্যাপার দূর করার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তাদের মধ্যে নিজের ঠাই করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

বর্তমান যুগের সারার্থ নিয়ে তীব্র ভাবাদর্শীয় সংগ্রাম চলছে। বুদ্ধিজীয়া প্রচারে বর্তমান যুগকে দেখানো হচ্ছে কিভাবে, কী তার উদ্দেশ্য?

বুদ্ধিজীয়া ভাবাদর্শের বাঁকাচোরা আয়নায়

আমাদের যুগকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার বুদ্ধিজীয়া তত্ত্ব আছে অনেক। তবে ধ্যান-ধারণার প্রাচুর্যের আড়ালে একটা ব্যাপারে সেগুলি সাধারণ: পুঞ্জিতন্ত্রকে বাঁচানো, সমাজতন্ত্রের বিপরীতে ‘ইতিবাচক’ বুদ্ধিজীয়া আদর্শ উপস্থাপনের প্রয়াসে। সমাজতন্ত্র খোলাখুলি

ঘোষণা করে কী তার লক্ষ্য, তার জন্য সংগ্রামের কী নীতি। বুদ্ধজোয়া ভাবাদর্শ ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের ঘাটতি টের পেলেও দেখাতে চায় কী জন্য সংগ্রাম করা উচিত।

তাহলে, কী আদর্শের জন্য সচেতন হতে হবে, আমাদের কালের চেহারাটা কেমন? এ প্রশ্নের যেসব উত্তর মিলেছে, তাদের পেছনকার ইতিহাসটা অতি শিক্ষাপ্রদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) কিছু পরেই পশ্চিম ইউরোপে দেখা দেয় ‘মালিকানা উবে যাওয়া’, ‘আয়ের ক্ষেত্রে সমমাত্রিকতা ও বিপ্লব’, ‘পুঁজির গণতন্ত্রীভবন’, ‘মধ্য শ্রেণী’, ‘শ্রেণীর অন্তর্ধান’ ইত্যাদি নানা ধারণা। পরে সেগুলি সম্মিলিত হয় ‘জন পুঁজিবাদ’ তত্ত্বে, অতঃপর তার পরিপূরণ করা হয় ‘সর্বজনীন সমৃদ্ধির’ রাষ্ট্র বিষয়ে ধারণা আমদানি করে। এসবের রচয়িতারা দেখাবার চেষ্টা করে যে পুঁজিতন্ত্র বদলে গেছে, ‘রূপান্তরিত’ হয়েছে। আগে তা সত্যিই ছিল খারাপ, মেহনতি জনগণের দুঃখকষ্ট ঘটাত, পীড়ন করত। এখন তা জনচরিত্র লাভ করেছে, রূপান্তরিত হয়েছে ‘গণতান্ত্রিক’, ‘মানবিক’ সমাজে, যা প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য সযত্ন। পুঁজিতন্ত্র যেহেতু বদলে গেছে, বুদ্ধজোয়া তাত্ত্বিকেরা দাবি করলেন, তাই তার ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কী হবে, যা ইতিমধ্যেই একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে? তার অস্তিত্ব গুঁরা লক্ষ্য না করার, বর্তমান দুনিয়ার বিশ্লেষণে সেটা হিসেবে না ধরার চেষ্টা করলেন।

অঁচিৰে বাস্তব জীবনই এইসব মোহেৰ অবসান ঘটায়।
 প্রথমত, নতুন শক্তিতে নিজের 'সত্যকাৰ' প্রকৃতি মেলে
 ধৰতে দোঁৱি কৰল পুঁজিতন্ত্ৰ, দেখা গেল: সামাজিক
 পীড়ন, বেকাৰি, মূদ্ৰাস্ফীতি, সামৰীকৰণ।

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্ৰিক নিৰ্মাণেৰ পথ নিয়োঁছিল
 যেসব দেশ, অলপদিনেৰ মধ্যেই তাৰা বিপদল সাফল্য
 লাভ কৰল অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান,
 শিল্পে। সমাজতন্ত্ৰেৰ জগৎ বেড়ে উঠাছিল, সদ্দৃঢ়
 হাঁছিল, পোঁৱৰু অৰ্জন কৰাঁছিল। ১৯৩৭ সালে যেখানে
 সমাজতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰদেৱ ভাগে ছিল বিশ্ব ভূখণ্ডেৰ প্ৰায়
 ১৭% আৰ অধিবাসীদেৰ ৯%, ১৯৬০ সালে তা
 দাঁড়ায় যথাক্ৰমে ২৫.৯ আৰ ৩৫ শতাংশে। বিশ্বেৰ
 শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্ৰিক দেশেৰ আপেক্ষিক গুৰুত্ব
 যেখানে ছিল ১০ শতাংশেৰও কম, সেখানে ১৯৫০
 সালে তা দাঁড়ায় ২০, ১৯৫৫ সালে ২৭ আৰ ১৯৬০
 সালে ৩৬ শতাংশ। তখন কি আৰ সমাজতন্ত্ৰকে
 অগ্ৰাহ্য কৰা যেত? অবশ্যই না।

বুৰ্জোয়া পিণ্ডিতোৱা শূদ্ৰ কৰলেন পুঁজিতন্ত্ৰ আৰ
 সমাজতন্ত্ৰেৰ অন্তপাত বিশ্লেষণ, অৰ্থাৎ দেখতে
 লাগলেন মানবজাতিৰ গতিৰ আন্তৰ্জাতিক দিকগুণি।
 পুঁজিতন্ত্ৰেৰ সমস্যা আৰ সমাজতন্ত্ৰেৰ প্ৰগতি নিয়ে
 তুলনা শূদ্ৰ হল। কিন্তু তুলনাটা চলল কেমন ধাৰায়?

তাৰ জবাব মিলবে 'একক শিল্পজীবী সমাজেৰ'
 মতবাদ থেকে। তাৰ ৰচয়িতাৰা দাবি কৰেন: যেমন
 পুঁজিতান্ত্ৰিক, তেমনি সমাজতান্ত্ৰিক, সমস্ত শিল্পোন্নত
 দেশই শিল্পজীবী সমগ্ৰ 'এককেৰ' উপাদান। পাৰ্থক্যেৰ

চেয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বেশি। গুঁরা বললেন, উৎপাদনের উপায় কার হাতে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, টেকনিক বিকাশের দিক থেকে সমস্ত শিল্পোন্নত দেশ একই রকম। চাপা দেওয়া হল প্রধান প্রশ্নটা। কেননা, মেহনতি নাকি পুঁজিপতি, কাদের হাতে উৎপাদনের উপায়, তার ওপর নির্ভর করেই চলে বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদের বণ্টন, পরিকল্পিত অর্থনীতি অথবা অর্থনীতিতে নৈরাজ্য, যা থেকে অবিরাম দেখা দেয় সংকট, বেকারি, মদ্রাস্থিতি। মালিকানার যা রূপ, তা দিয়েই নির্ধারিত হয় উৎপাদন বিকাশের গতিবেগ, তা পরিচালনার রূপ ও পদ্ধতি। বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা এসব ব্যাপারেই মূখ্য বৃঞ্জে থাকেন। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যকে ঝাপসা করে দেওয়ায় নতুন সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব চাপা দেওয়া, তার তাৎপর্য খাটো করে দেখানো, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে তাকে এক সারিতে ফেলায় সাহায্য হয়। তাতে ক'রে সমাজতন্ত্র যে এমন একটা সমাজব্যবস্থা যা পুঁজিতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করছে, যার পক্ষে ভবিষ্যৎ, এ প্রশ্নটা আর বিবেচ্য হয় না।

কিছুকাল পরে দেখা দিল এই ধারণা যে 'একক শিল্পজীবী সমাজের' জায়গা নেবে 'শিল্পোত্তর' আর 'টেকনোট্রোন সমাজ'। এ সব তত্ত্বের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য থাকলেও তাদের সামাজিক মর্মার্থ একই — পুঁজিতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য মূছে দেওয়া, সেকেলে হয়ে পড়া সমাজব্যবস্থাকে জাতে তোলা, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তাকে এক কোঠায় ফেলা।

এই ধরনের আরেকটা তত্ত্ব, সমকেন্দ্রাভিমুখ তত্ত্বের

রচয়িতারা পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য মানেন, তবে বলেন যে দুই ধরনের দেশ যেহেতু একই বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির পরিস্থিতিতে রয়েছে, তাই ভবিষ্যতে তারা এক বিন্দুতে মিলবে, অর্থাৎ পরস্পর কাছিয়ে আসবে। যত কাছিয়ে আসবে, ততই তারা তাদের প্রকৃতিগত নেতিবাচক দিকগুলি বর্জন করে উত্তম, ইতিবাচক গুণগুলি পরস্পর গ্রহণ করতে থাকবে। পরিণামে, তাঁদের মতে, সমাজতান্ত্রিক আর বুর্জোয়া রাষ্ট্র এমন অবস্থায় পৌঁছবে, যখন তাদের মধ্যে আর পার্থক্য থাকবে না।

সমকেন্দ্রাভিমুখ তত্ত্বের রচয়িতাদের জল্পনা-কল্পনা এই অবজেকটিভ ঘটনাটা আশ্রয় করে যে বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির গভেই গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত। যেমন: উচ্চ মাত্রায় শিল্পায়ন, অধিবাসীদের ব্যাপক শিক্ষা, সুদক্ষ শ্রমশক্তি, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি। ফলে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে পুঁজিতন্ত্রও তাই করছে যা করে সমাজতন্ত্র। তবে মনে রাখা দরকার যে এসব প্রক্রিয়া চলছে পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে, তার মর্মার্থ না বদলিয়ে এবং সমাজতন্ত্রের দিকে তাকে কাছিয়ে না এনে।

সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের তুলনা করতে গিয়ে বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা নীতিগত এই ঘটনাটা ধামাচাপা দেয় যে ব্যবস্থাদুটির ইতিহাস বিভিন্ন। পুঁজিতন্ত্রের পেছনে রয়েছে দুই শতাধিক বছর। সমাজতন্ত্র বিদ্যমান ৭০ বছরের বেশী, তদুপরি তার মধ্যে অনেক বছরই

গেছে মদ্রুত্তি যদ্বন্ধে এবং তারপর অর্থনীতি পদনরদ্বারে।
তাই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্র
রয়েছে তার সম্পদর্গীকরণের পর্যায়।

সমস্ত বদ্বর্জোয়া তত্ত্বই দেখা দিয়েছে সমাজতন্ত্রের
সাফল্য লাভ আর জনগণের চোখে পদ্বর্জিবাদ হয়ে হয়ে
ওঠার ফলে। তাই বদ্বর্জোয়া ভাবদর্শীরা পদ্বর্জিতন্ত্রের
কোনো ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ না দেখতে পেয়ে টিকে
থাকার চেষ্টা করছে সমাজতন্ত্রের ঘাড় ভেঙে, তার
ঐতিহাসিক সম্ভাবনা ও পরিপ্রেক্ষিত কাজে লাগাচ্ছে।
তদনরূপ অন্যান্য ধারণার মতো সমকেন্দ্রাভিমুখ তত্ত্বও
বদ্বর্জোয়া-শ্রেণীগত অবস্থান থেকে, বিকৃত রূপে বিশ্বে
সক্রিয় প্রক্রিয়াগদ্বলির, আমাদের যদ্বর্গের মর্মার্থ ও
চরিত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে।

উক্ত তত্ত্বগদ্বলির সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের নির্দিষ্ট
কিছদ্ব মহলের চাপে বদ্বর্জোয়া প্রচার খোলাখদ্বলি
প্রতিক্রিয়াশীল ধব্বনিই দেয়। সেগদ্বলির মদ্বলকথা
হল সমাজতন্ত্র নাকি একটা ঐতিহাসিক আপাতকতা,
কোনো কোনো জাতির ‘ভ্রান্তি’, যার ‘সংশোধন’
প্রয়োজন, জেহাদ ঘোষণা করে তাদের বিরদ্বন্ধে। বিশ্বের
বিভিন্ন মহাদেশে নিশ্চিত বিশ্বাসে নতুন জীবন গড়ছে
যে গোটা পনের রাষ্ট্র তাদের কি ‘বিভ্রান্ত’ বলে ধরা
যায়? সামাজিক ও জাতীয় মদ্বুক্তির জন্য কোটি কোটি
মেহনতি আর গোটাগদ্বটি এক-একটা জাতি যে সংগ্রাম
চালাচ্ছে তাকে কি উপেক্ষা করা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব
দিতে হলে বর্তমান যদ্বর্গের প্রকৃত চরিত্রটা দেখা দরকার।

বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান কালের ওপর সমানোযোগ ও সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিপাতে তার প্রধান প্রধান ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলিকে বেছে নেওয়া সম্ভব। বিশ্বে ঘটিছে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লব, টলমল করছে সাম্রাজ্যবাদ, বিলুপ্ত হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র স্থাপিত কলঙ্কজনক ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, চলছে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম। এসব থেকে এই সিদ্ধান্তে আসার ভিত্তি থাকে: বর্তমান যুগের মূলগত অন্তঃসার হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতা। এটা হল সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লব, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ধ্বংসের যুগ, এটা হল সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসক পলিসির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সমাজবিকাশের প্রধান চালিকা শক্তিগুলির, — বিশ্ব সমাজতন্ত্র, শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলন, সদ্যোমুক্ত রাষ্ট্রগুলির জনগণ, ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে সংগ্রামের যুগ।

বর্তমান যুগের কেন্দ্রে রয়েছে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রকাশ পাচ্ছে বর্তমান কালের বিকাশের মূলধারা — বিশ্বায়তনে মেহনতিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। বিশ্ব সমাজতন্ত্র যে আন্তর্জাতিক ঘটনাধারার ওপর ক্রমেই বেশি করে প্রভাব ফেলেছে, শান্তির জন্য সংগ্রামে উদ্যোগ নিচ্ছে, এবং তাতে করে প্রকাশ করছে সমস্ত সজ্জন লোকের

অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা, সেটা হল ওই ধারারই
অভিব্যক্তি।

বর্তমান যুগের মূলগত দিক ও বৈশিষ্ট্য কী কী?

আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল তার
উৎক্রমণমূলক চরিত্র। মানব ইতিহাসে আগে কি এমন
পর্ব দেখা গিয়েছিল যখন এক ব্যবস্থা থেকে অন্যটায়
উৎক্রমণ ঘটেছে? হ্যাঁ, দৃষ্টান্তস্বরূপ সামন্ততন্ত্র থেকে
পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল এই যে
তাতে একটা শোষণ ব্যবস্থা থেকে যেটায় উত্তরণ ঘটেছে,
তাও সমানই শোষণ ব্যবস্থা, একইরকম শ্রেণীর
বৈপরীত্য, ধনী আর দরিদ্রে বিভক্ত। এখন প্রশ্নটা
একেবারেই অন্য সমাজে উত্তরণ নিয়ে, যেখানে নেই
পীড়ন, বিত্তবান আর নিঃস্বৈ লোকদের ভাগাভাগি,
যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক সাম্য, খোদ
মেহনতিদের হাতেই রয়েছে ক্ষমতা। এই অবস্থাচক্রের
ফলেই দেখা দিচ্ছে নতুন আর পুরনোর মধ্যে সংগ্রামের
এতটা তীব্রতা। নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষায় কোনো উপায়
অবলম্বনেই পুঁজিপতিদের দ্বিধা নেই।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পথ নিয়ে অনেক জাতি
এই সিদ্ধান্তে এসেছে: সত্যকার স্বাধীনতা সম্ভব শোষণ
ব্যবস্থা বিলোপের ফলে। এই থেকেই একসারি দেশ
নিয়েছে সমাজতন্ত্রমুখিতার পথ।

আমাদের যুগের মর্মার্থসূচক দিক হল এই যে এটা
বৈপ্লবিক যুগ। মার্কসবাদ যা প্রতিপাদিত করেছিল এবং
কার্যক্ষেত্রে যা সমর্থিত হয়েছে, নতুন সমাজব্যবস্থায়
উত্তরণ সম্ভব কেবল সেই বৈপ্লবিক পদনগঠনের ফলে।

অনেকে অস্বীকার করে না যে বিশ্ব চলেছে সমাজতন্ত্রের দিকে। কিন্তু তারা মনে করে যে পুঁজিতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রে পুনর্গঠিত করা সম্ভব মন্থর পরিবর্তন, সংস্কারের পথে, বিপ্লব দিয়ে নয়। এই ধরনের মত পোষণ করেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতারা। বেশ কয়েকটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশে তাঁরা বহু বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, কিন্তু এ দেশগুলি সমাজতন্ত্রের দিকে এক পা-ও এগোয় নি। বাকি সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়া যেসব ব্যাধিতে পীড়িত, সেগুলি তাদেরও রেহাই দেয় নি।

আমাদের যুগের বৈপ্লবিক চরিত্রের চেতনা হল তার অন্তঃসার, চালিকা শক্তি, ঐতিহাসিক চৌহান্দি বোঝার চাবিকাঠি। এই দিকটা যে অস্বীকার করে, সে বর্তমান যুগকে বুঝবে না।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে কেবল উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামই নয়। তার একটা মূলঙ্গ হল সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে পরিবিকাশমান গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবও, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলিও। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমস্ত শক্তিকে শ্রমিক শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ করে যেমন জাতীয়, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিসরেও।

বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য হল তার অন্তঃসারে মূলগত বিরোধ। আন্তর্জাতিক চরিত্রের বিরোধ পৃথিবীতে কম নেই। এগুলি হল পুঁজিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ, পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ — বিভিন্ন দেশ ও দেশগোষ্ঠীর মধ্যে

বিরোধ। ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে সদ্যোন্মুক্ত দেশ আর ভূতপূর্ব যে প্রভু দেশগুলি নতুন উপায়ে তাদের শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বিরোধ। কিন্তু প্রধান বিরোধ হল পূর্বাভিত্তিক আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ। যুগের অন্য সমস্ত বিরোধের ওপর তার প্রভাব নির্ধারক। কিভাবে তার সমাধান হবে, তার ওপর নির্ভর করছে জাতিসমূহের ভাগ্য, পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা ও সুদৃঢ় করার প্রশ্ন। আর বিপরীত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক বিতর্কের যে প্রশ্ন, তার সমাধান হওয়া চাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে, যা নতুন সমাজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির দাবি মেটাতে পুরোপুরি। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জিত হয় সামরিক দ্বৈরথে নয়, পূরনোর চেয়ে নতুন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশে।

ইতিহাস নিঃসন্দেহে দেখিয়েছে: সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যত শক্তিশালী হবে, শান্তিও হবে তত পাকাপোক্ত, সামাজিক ও জাতীয় মূর্ত্তির জন্য সংগ্রামে সমস্ত জাতির পক্ষে সাফল্যের বাস্তব সুযোগও দেখা দেবে তত বেশি। এই থেকেই আসে শান্তি, প্রগতি ও সামাজিক ন্যায়ের দুর্গ সমাজতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করার জন্য গ্রহের সমস্ত সজ্জন মানুষের উন্মুখতা। উলটো দিকে, সর্বোপায়ে বর্জ্যেরা চেষ্টা করে সমাজতন্ত্র থেকে লোকেদের সরিয়ে দিতে।

বর্তমান যুগের মৌলিক লক্ষণ হল এই যে বিশ্বে শক্তির অনুরূপ বদলে যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের অনুরূপে।

সামাজিক বিকাশের নির্ধারক কারিকায় সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থার ক্রমিক পরিণতি হল আমাদের কালের পার্থক্যসূচক দিক। এই পরিণতি একটা জটিল ও দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া, গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগের সারার্থ তাতে নিহিত। বিশ্বে আর পুঁজিতন্ত্রের প্রভুত্ব নেই, তা মৃত্যুদণ্ডিত, আগের মতো বিশ্ব ঘটনাবলির ধারার ওপর নির্ধারক প্রভাব ফেলতে তা অক্ষম। জনগণের অভিপ্রায় গ্রাহ্য না করে সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান কালের গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্ন, সর্বাগ্রে যুদ্ধ ও শান্তির ভাগ্য নিয়ে সমস্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শ্বাস রুদ্ধ করতে, সমাজতন্ত্রের পদক্ষেপ ঠেকাতে তা অক্ষম। আন্তর্জাতিক সমস্যা দি সমাধানের উদ্যোগ ক্রমেই চলে আসছে সমাজতন্ত্রের হাতে, অবিচলে বেড়ে উঠছে ইতিহাসের গতিপথে তার প্রভাব। আর মানবজাতি যে উত্তম জীবন, যুদ্ধ, শোষণ, পীড়ন ছাড়া জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে, এটা তার নিভরযোগ্য গ্যারান্টি।

কিন্তু সে জীবনের পথ জুড়ে আছে সাম্রাজ্যবাদ, তার আগ্রাসক নীতি। কোটি কোটি মনুষ্যজীবন গ্রাস-করা দুটো বিশ্ব যুদ্ধ বাধাবার পর এখন তা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। মানব প্রতিভার কৃতিত্বকে সাম্রাজ্যবাদ লাগাচ্ছে পৈশাচিক ধ্বংসশক্তির অস্ত্র নির্মাণের সেবায়। সেরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে এমন বিপদ বোড়ে উঠছে গোটাগুটি সব জাতিকে বলি দিতে প্রস্তুত সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির পলিসিতে। শেষ পর্যন্ত তাতে ভূগোলকব্যাপী সামরিক সংঘাতের বিপদ ঘনাচ্ছে

যার ফলে কেউই বিজিতও হবে না, বিজয়ীও হবে না, কিন্তু মানব সভ্যতাই ধ্বংস পেতে পারে। সেইজন্যই সমাজতন্ত্রের দুনিয়া বর্তমান কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা সমাধানে এত বিপুল শক্তি নিয়োগ করেছে। ২০০০ সনের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ ও সর্বত্র বিলোপ, আত্মবিলোপের বিপদ থেকে মানবজাতির মুক্তি, বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের একটি কর্মসূচি পেশ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ হল সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্রের, সমস্ত সামাজিক শক্তি শ্রুভেচ্ছাপ্রণোদিত মানুষের অতি জরুরি কর্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের একটা বড়ো কৃতিত্ব হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব। মানব ইতিহাসে এমন গণ আন্দোলন, জন অভ্যুত্থান আর যুদ্ধের কথা কম জানা নেই, যাতে সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন ঘটেছে, পুরনো, অচল হয়ে পড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জায়গায় এসেছে নতুন। কিন্তু বিগত ঐতিহাসিক যুগের সমস্ত সামাজিক বিপ্লবগুলির চরিত্র ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সেগুলির বড়ো বড়ো ভাবপ্রবক্তারা যে কেবল বিপ্লবের আবির্ভাব ও গতিপথের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি তাই নয়, তাদের সম্ভাব্য পরিণামও দেখতে পান নি। ইতিহাসে এই প্রথম বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বেই প্রতিপাদিত হল আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

অনিবার্যতা এবং পুঞ্জীভবনের উচ্ছেদ আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনতিদের পক্ষ থেকে সচেতন সংগ্রামের আবশ্যিকতা।

সামাজিক বিপ্লবগুলির ঐতিহাসিক অপরিহার্যতা

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস ও এঙ্গেলস পুঞ্জীতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের অবজেকটিভ নিয়মগুলি উদ্ঘাটিত করে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসেন যে পুঞ্জীতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বৈর-বিরোধগুলির তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অনিবার্য। তাঁরা বললেন, সামাজিক বিপ্লব একটা আপাতক ঘটনা বা ইতিহাসের ‘স্বাভাবিক’ গতির কোনো লঙ্ঘন নয়। এগুলি হল সামাজিক বিকাশের নিয়মশাসিত উদ্ভব ও অন্তর্ধানের এক-একটা পর্যায়, যার আওতায় অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিরোধগুলির সমাধান হয়। জন্মদাতা সামাজিক বিরোধগুলি যতটা অপরিহার্য, বিপ্লবও ততটাই।

কিসের ভিত্তিতে দেখা দেয় এবং বিকশিত হয় সামাজিক বিরোধ? সে ভিত্তি হল লোকেদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরন, যা গড়ে উঠেছে ইতিহাসে। উৎপাদনের ধরন বা পদ্ধতি হল সমগ্রভাবে, উৎপাদনী শক্তি, যার মধ্যে পড়ে সামাজিক উৎপাদনের অংশী হিশেবে লোকেরা, শ্রমের হাতিয়ার আর শ্রম প্রয়োগের

বস্তু, এবং উৎপাদনী সম্পর্ক অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক, শ্রেণী সমাজে যা দেখা দেয় প্রভুত্ব আর অধীনতার সম্পর্ক হিশেবে। উৎপাদনী শক্তি হল উৎপাদনের ধরনের বা প্রণালীর প্রধান দিক, তার বিকাশের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মিলতে হবে উৎপাদনী সম্পর্কে। উৎপাদনী সম্পর্ক যদি হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক, তাহলে যে বিরোধ দেখা দেয় তার মীমাংসা হয় উৎপাদনী সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে, এবং তার পরিণাম স্বরূপ উৎপাদনের পদ্ধতিতে পদ্ধতির স্থান নেয় নতুন। অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন থেকে আবার দেখা দেয় রাজনৈতিক, ভাবাদর্শীয়, সাংস্কৃতিক আর অন্যান্য সম্পর্ক-ব্যবস্থার তদনুযায়ী পরিবর্তন। একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থান নেয় অন্যটা। এইভাবে, মানবসমাজের ইতিহাসে আদিম গোষ্ঠী সমাজের জায়গায় আসে দাসতান্ত্রিক, তারপরে তার জায়গায় নেয় সামন্ততান্ত্রিক, পরে পুঁজিতন্ত্র — সর্বশেষ শোষণ সমাজ।

প্রতিটি সামাজিক বিপ্লবের সারার্থ হল উৎপাদনী শক্তির বিকাশের মান ও চরিত্রের সঙ্গে উৎপাদনী সম্পর্কের সামঞ্জস্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে সামাজিক বিপ্লবের বিজয়ে সর্বত্রো বোঝায় নতুন, অগ্রণী উৎপাদনী সম্পর্কের প্রভুত্ব স্থাপন।

কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটা ‘আপনা-আপনি’ ঘটে না। সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য উৎপাদনী শক্তির প্রভাব প্রকাশ পায় লোকেদের ব্যবহারে যা নতুন

উৎপাদনী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অথবা পূরনোটা রক্ষায় আগ্রহী। এতে ক'রে উৎপাদনী শক্তি আর উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ প্রকাশ পায় শ্রেণীদের মধ্যে বিরোধ হিশেবে, যারা এক একটা সম্পর্কের বাহকের কাজ করে।

এ বিরোধের সমাধান হয় শ্রেণী সংগ্রামে, তার ফলাফল দিয়ে নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের চরিত্র এবং সেইসঙ্গে তা উৎপাদনী শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে, নয় ঠেকিয়ে রাখে।

প্রতিটি সামাজিক বিপ্লব শ্রেণীদের অবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটায়, ঐতিহাসিকভাবে যে শ্রেণী প্রগতিশীল তার বিজয় নিশ্চিত করে। এ বিজয়ে সূচিত হয় সামাজিক সম্পর্কের সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রেণী প্রভুত্বের পরিবর্তন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিজয়ী শ্রেণী নিজের প্রভুত্ব চালিয়ে যাবার প্রধান প্রধান হাতিয়ার হিশেবে রাষ্ট্রক্ষমতা আর শাসন নেয় নিজের হাতে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিজয়ী শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনের মূল উপায়গুলির মালিক এবং মালিকানার যে রূপটায় এ শ্রেণীর স্বার্থ মেটে সবচেয়ে বেশি, তার প্রাধান্যের ব্যবস্থা করে। অর্থনীতি আর রাজনীতিতে আধিপত্যকারী শ্রেণীর ভাবাদর্শ ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায় নির্দিষ্ট সমাজটিতে সামাজিক চেতনোর প্রধান উপাদান।

রাজনীতি, অর্থনীতি আর ভাবাদর্শে যেসব আমূল পরিবর্তন ঘটায় সামাজিক বিপ্লব, সেগুলি একটা দ্বন্দ্বিক ঐক্যে গ্রথিত। অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন

থাকে সামাজিক বিপ্লবের ভিত্তিতে, আবার তা থেকে প্রসূত রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় পরিবর্তনগুলির প্রভাব পড়ে অর্থনীতির বিকাশে। বিকাশের নির্দিষ্ট কোনো কোনো পর্যায়ে রাজনীতিতে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অপরিহার্য শর্ত রূপে। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুরূপ তাৎপর্য ধরতে পারে ভাবাদর্শীয় পরিবর্তনও। সমাজ জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে পরিবর্তনের যে দ্বন্দ্বিক সম্পর্কের কথা বলা হল, বিভিন্ন টাইপের সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার আত্মপ্রকাশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। সামাজিক বিপ্লবের টাইপ নির্ধারিত হয় তার শ্রেণী সার্থক দিয়ে, যাতে উদ্ঘাটিত হয় কোন কোন শ্রেণী তাদের প্রভুত্ব হারাচ্ছে, কারাই বা তা জয় করে নিচ্ছে।

সামাজিক বিপ্লবের টাইপ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

সামাজিক বিপ্লবের টাইপ হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য কোনখানে? সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে কেবল শ্রেণী প্রভুত্বের পরিবর্তনই সূচিত হয় না, শ্রেণী সমাজের যুগ থেকে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের সূত্রপাতও তা ঘটায়। পুঁজিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে উৎপাদনের যে সামাজীকরণ ঘটে, তাতে গড়ে ওঠে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা আর শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজের ভাগাভাগি বিলোপের আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

সমস্ত মেহনতি ও শোষিতদের স্বার্থে বিপ্লব হিশেবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মূলগত পার্থক্য থেকেই পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে যায় সমস্ত বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের সমষ্টিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের নির্ধারক ভূমিকা। বুর্জোয়া যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা স্বহস্তে ধরে রাখছে ততদিন পর্যন্ত সে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের উদ্ভব ঘটতে দেবে না।

অর্থনৈতিক প্রভুত্ব থেকে বুর্জোয়াকে বঞ্চিত করতে হলে প্রথমে দরকার তাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা। তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের বিজয় নিশ্চিত করার প্রধান শর্ত হল রাজনৈতিক বিপ্লব, যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহনতিদের ক্ষমতা এবং গড়া হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইতিহাসে এই প্রথম প্রভু শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় মেহনতিদের একটি শ্রেণী — প্রলোতারিয়েত। শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা কাজে লাগায় অর্থনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় প্রভুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক প্রভুত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে স্থাপন করে উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা। শোষক রাষ্ট্র তুলে দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করে নতুন ধরনের রাষ্ট্র যা ইতিহাসে এই প্রথম রক্ষা করে অধিবাসীদের অত্যধিকাংশের স্বার্থ। লোকেদের চেতনায় তা ঘটায় আমূল পরিবর্তন, যা সমাজতান্ত্রিক

সমাজ নির্মাণে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কর্তব্য ও লক্ষ্যের উপযোগী।*

বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত বৈপ্লবিক পুনর্গঠন এক লহমায় সাধিত হতে পারে না, তার জন্য দরকার বিকাশের নির্দিষ্ট একটা পর্ব, সেটা কত কাল চলবে তা নির্ভর করে এক-একটা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের বিশিষ্ট পরিস্থিতির ওপর।

সুতরাং ব্যাপক অর্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বলা যায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয় পরিবর্তনের উল্লিখিত ঐক্যস্বরূপ সামাজিক বিপ্লব আর সংকীর্ণ অর্থে তা হল রাজনৈতিক বিপ্লব, বুদ্ধোন্নতির স্থলে মেহনতিদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মতো বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

প্রথমে দেখা যাক শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতিদের কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ের নিয়মবদ্ধতা, শর্ত, পথ ও রূপের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে। তারপর পর্যালোচনা করব, মেহনতিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর সমাজ জীবনের সমস্ত দিকের পুনর্গঠনের সমস্যা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান প্রধান নিয়মবদ্ধতা

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে পুঁজিতন্ত্রের স্থলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা

* See: Lenin V. I. *Collected Works*, 1977, Vol. 29, p. 135; 1974, Vol. 30 pp. 263-265.

প্রমাণিত হয়, সেটাকে বড়যন্ত্র আর রাষ্ট্রীয় কু-দেতা মারফত কিংবা নাশকতামূলক ফ্রিয়াকলাপ, বিদ্যমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ও সশস্ত্র সংগ্রাম 'উশাকিয়ে তোলার' মাধ্যমে অবিলম্বে সমাজতন্ত্র 'চালু করা' নাকি সম্ভব, এমন কথা প্রতিপাদনের জন্য কাজে লাগিয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যেমন কিছু কিছু পক্ষপাতী, তেমনি তার বিরোধীরাও। প্রথমোক্তরা যেক্ষেত্রে মনে করত যে বিপ্লব ঘটাবার জন্য বিপ্লবীদের এক-একটা গোষ্ঠীর ইচ্ছা, দৃঢ়সংকল্প থাকাই যথেষ্ট, জনগণ তাদের অনুসরণ করবে, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়রা সমস্ত বিপ্লবীদের সর্বাগ্রে কমিউনিস্টদের দেখাতে চাইত বড়যন্ত্রী, সম্রাসবাদী বলে, যারা নাকি ক্ষমতা দখল করে সর্বগ্রাসী, গণতন্ত্রবিরোধী আমল প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের উপায় সম্পর্কে এমন 'ব্যাখ্যায়' বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিগত তাত্ত্বিক সূত্র যে কেবল বিকৃতই হয় তাই নয়, তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার হাতে অস্ত্রই তুলে দেওয়া হয়। ওই ধরনের কল্পনার বিপরীতে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 'ফরমাশ' দিয়ে, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষায় হবার নয়, তার জন্য প্রয়োজন ঐতিহাসিক বিকাশক্রমে গড়ে ওঠা পূর্বশর্ত ও পরিস্থিতি, এবং তা ঘটে তার অন্তর্নিহিত নিয়মবদ্ধতা অনুসারে।

বিপ্লবের অবজেকটিভ পূর্বশর্ত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিয়মশাসিত প্রকৃতি প্রতিপাদিত করে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বকারেরা তেমন সব

অবজেকটিভ পদ্বশত উন্ম্বাটিত করেছেন যাতে পুঁজিতন্ত্রের স্থলে সমাজতন্ত্রের আগমন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। প্রথমেই তার মধ্যে পড়ে উৎপাদনী শক্তির এমন মাদ্রায় বিকাশ যা তার সামাজীকরণ দাবি করে। কলকারখানা নিয়ে বৃহৎ শিল্প, তাতে এক-একটা উদ্যোগে হাজার হাজার শ্রমিকের কেন্দ্রীভবন, আগেকার ছড়ানো ছিটানো উৎপাদন ও শাখাগদুলির একক অর্থনৈতিক দেহে পরিণতি, বিশ্ব বাজারের প্রচণ্ড বৃদ্ধি — এই সমস্ত প্রক্রিয়ারই বিরোধ বাদে আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক রূপের সঙ্গে। তার সাক্ষ্য যেমন পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির বারংবার পুনরাবৃত্ত সংকট, তেমনি শ্রম আর পুঁজির মধ্যে অবিরাম বর্ধমান শ্রেণী সংগ্রাম।

পুঁজিতন্ত্রের মূলগত বিরোধ হল উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর আত্মসাৎ করার ব্যক্তিগত পুঁজিতান্ত্রিক রূপ, পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়, সাম্রাজ্যবাদে তা তার সংকট মাদ্রায় উঠেছে। লেনিন লিখেছেন, ‘...রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বৈষয়িক প্রস্তুতি, তার দ্বারদেশ, ঐতিহাসিক সোপানের সেই ধাপ, যার (ধাপের) আর সমাজতন্ত্র বলে কথিত ধাপটার মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী ধাপ নেই।’*

* Lenin V. I. *Collected Works*, 1980, Vol. 25, p. 363.

আমাদের কালে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবে ত্বরান্বিত হচ্ছে অর্থনীতির সামাজীকরণ প্রক্রিয়া। একচেটিয়া পুঁজির প্রভুত্বের পরিস্থিতিতে সামাজিক বৈরিতাগুলি আরো তীব্র হচ্ছে, দেখা দিচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের নতুন নতুন বিরোধ।

কিন্তু এই বিরোধগুলি নিজেরা আপনা-আপনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে পারে না, তাদের সমাধান হয় কেবল মেহনতি জনগণের ক্রিয়াকলাপের ফলে। মেহনতির মাতে বিপ্লবে উত্থিত হয়, তার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণে উদ্ভূত হয়ে ওঠা প্রয়োজন। কী কী অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ পূর্বশর্তে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে?

বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। বৈপ্লবিক অভিযানে নামার জন্য জনগণ তৈরি হয়ে ওঠে তেমন একটা সুদৃঢ় রাজনৈতিক সংকট থাকলে, যা থেকে দেখা দেয় বৈপ্লবিক পরিস্থিতি। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি এই লক্ষণগুলিতে চিহ্নিত:

প্রথমত, শাসক শ্রেণী ও গ্রুপগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধের এমন তীক্ষ্ণতা যে তারা নিজেদের শ্রেণী প্রভুত্ব বজায় রাখতে, আগের ধরনে শাসন চালাতে আর পারছে না এবং নিপীড়িত শ্রেণীরা আগের মতো দিন কাটাতে চাইছে না;

দ্বিতীয়ত, এমন অবস্থা যখন মেহনতিদের জীবনের বৈষয়িক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত সীমায় অবনত হয়েছে;

তৃতীয়ত, মেহনতিদের রাজনৈতিক সক্রিয়তার যথেষ্ট বৃদ্ধি, বিকাশের শান্তিপূর্ণ পর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক নিষ্ক্রিয়তা আর জাভ্য তারা কাটিয়ে উঠছে।*

অর্থাৎ, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি হল সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বাস্তবে বিদ্যমান বিরোধগুলির আত্মপ্রকাশ তাদের চূড়ান্ত তীব্রতা বৃদ্ধির মূহুর্ত্তে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব অবশ্য-অবশ্যই মেহনতিদের বৈষয়িক অবস্থার প্রচণ্ড অবনতির সঙ্গে জড়িত থাকবে এমন নয়: তা দেখা দিতে পারে মেহনতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধির ফলে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য গণ আন্দোলনের জোয়ারে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি দেখা দেয় পুরো একসারি অবজেকটিভ কারণের বিজড়নে, কিন্তু বিপ্লবে তার পরিবিকাশ নির্ভর করে বিপ্লবের জন্য মেহনতি জনগণ কতটা প্রস্তুত হয়েছে, তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কতটা তৈরি, মূলত তার ওপর।

মেহনতিদের মধ্যে প্রভাব অর্জনের জন্য কমিউনিস্টদের দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রাম চালাবার শিক্ষা দিয়েছেন লেনিন। তিনি বলেছেন, ‘...বিপ্লবের প্রতি নিঃস্বার্থ বিশ্বস্ততা, বৈপ্লবিক প্রচার নিয়ে জনগণের নিকট আবেদন কখনো বৃথা যায় না এমনকি তখনো

* See: Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 21, pp. 213-214; Vol. 31, pp. 84-85.

যখন বীজ বোনা আর ফসল তোলার মধ্যে থাকে পুরো কয়েকটা দশকের ব্যবধান...।’*

সাবজেক্টিভ ব্যাপারটার পরিপক্বতা, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নিয়মবদ্ধতা হিশেবে গণ অভিযানে এগুতে মেহনতিদের প্রস্তুতি নির্ধারিত হয় কী দিয়ে?

বিপ্লবের সাবজেক্টিভ পূর্বশর্ত। সামাজিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা বাস্তবে রূপায়িত হয় নিজেদের স্বার্থ ও লক্ষ্য নিয়ে ভাবিত, সে সম্পর্কে সচেতন লোকেদের ক্রিয়াকলাপ মারফত। বিপ্লব তাই মর্দু আন্দোলনের কেবল একটা অবজেক্টিভ আবশ্যিক এবং নিয়মশাসিত পর্যায়ই নয়, একই সময়ে তার লক্ষ্যও। অবজেক্টিভ প্রক্রিয়াস্বরূপ সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অবজেক্টিভ ব্যাপারটার প্রভাব হবে ততই কার্যকর, যত গভীর হবে জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা, যত তাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে থাকবে সঙ্গতিপরায়ণতা আর সংগঠনশীলতা।

বিপ্লবের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে পরিষ্কার বুদ্ধে নেওয়া দরকার সামাজিক-শ্রেণীগত শক্তিগুলির বিন্যাস, স্থির করে নেওয়া দরকার বিপ্লবে কোন কোন শ্রেণী ও সামাজিক স্তরের প্রগতিশীল ভূমিকা নেওয়ার কথা, কোন কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালানো আবশ্যিক, কোন কোন শ্রেণী ও সামাজিক স্তর এ সংগ্রামে থাকবে নিরপেক্ষ এবং এ নিরপেক্ষতায় কার লাভ। যেসব শ্রেণী

* Lenin V. I. *Collected Works*, 1973, Vol. 18, p. ৩১.

ও সামাজিক স্তর অবজেকটিভ ক্ষেত্রে বিপ্লবে আগ্রহী এবং বিজয়ের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম চালায়, তারা হল বিপ্লবের চালিকা শক্তি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে আমূল সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম চালাচ্ছে কৃষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থী যুবজন, সমরসেবীদের তাৎপর্যপূর্ণ স্তরাদি।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বে লেনিন বিপ্লব সাধনে শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি জনগণকে প্রস্তুত করার প্রশ্ন, সে সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্ন বিচার করেন। এই সমস্ত প্রশ্নের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে বৈপ্লবিক তত্ত্বের সঙ্গে যা যুক্ত করছে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য জনগণকে সংগঠিত করছে, মেহনতিদের এমন এক অগ্রবাহিনী রূপে পার্টি বিষয়ে লেনিনীয় মতবাদ। তিনি লিখেছেন, ‘লৌহদৃঢ় এবং সংগ্রামে পোড় খাওয়া পার্টি ছাড়া, নির্দিষ্ট শ্রেণীটির সমস্ত সদ্যস্তির আস্থাভাজন পার্টি ছাড়া, জনগণের মনোভাব বদ্বতে ও তাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম পার্টি ছাড়া সাফল্যের সঙ্গে সেরূপ সংগ্রাম চালানো সম্ভব নয়।’* শ্রমিক আন্দোলনে ‘স্বতঃস্ফূর্তির’ স্বেচ্ছাবাদী তত্ত্বের দৃঢ় বিরোধী লেনিন এই কথায় জোর দেন যে বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া শ্রমিক আন্দোলন শূন্যকিয়ে আসে, বুদ্ধিজীবী প্রভাবের খপ্পরে পড়ে, নিজের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 31, pp. 44-45.

অর্ধশতাব্দিক বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয় যে সমস্ত অবজেকটিভ পূর্বশর্তের মধ্যে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নির্ধারক শর্ত হল এমন পার্টির অস্তিত্ব যা বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ওপর দণ্ডায়মান, বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য জনগণকে নিজের পেছনে টানতে সক্ষম।

বিপ্লবের জন্য জনগণের সমাবেশ। মেহনতিদের ব্যাপক স্তরের সঙ্গে যোগাযোগের দরুনই কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী, কেননা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংঘটক হল জনসাধারণ। তারা যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থানে চলে আসে, সেটা একটা অবজেকটিভ প্রক্রিয়া, যা সচল হয় বৈরগর্ভ সমাজের ভেতরকার বিরোধগুলির বিকাশের ফলে। এইসব বিরোধের চরিত্র দিয়েই নির্ধারিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এক-একটা শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের ভূমিকা। বিপ্লবের প্রতি বিভিন্ন শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ পায় রাজনৈতিক সংকট দেখা দেবার সময়। বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য জনগণ কতদূর তৈরি, নিজেদের আশ্রু ও অন্তিম স্বার্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে কতদূর সচেতন, তার ওপরে নির্ভর করে রাজনৈতিক সংকট পর্যবসিত হবে বিপ্লবের বিজয়ে, নাকি প্রতিবিপ্লবের বিজয়ে, অথবা কোনো একটা সাময়িক রফায়।

জনসাধারণের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয় কেবল অবজেকটিভ পরিস্থিতির কারণেই নয়, ভাবাদর্শীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রামের গতিপথেও তা সতেজে রূপ নিতে থাকে। বৈপ্লবিক সংগ্রামের নেতৃত্ব

দিতে গিয়ে পার্টি'কে তার ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির অবজেকটিভ পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে, আবার সেইসঙ্গে সে পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে পারা চাই রাজনৈতিক সংগ্রামের সচেতন সমর্থনে তাদের টেনে আনার জন্য।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের শান্তিপূর্ণ ও অশান্তিপূর্ণ পথ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করে তুলতে গিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি যেমন শান্তিপূর্ণ তেমনি অশান্তিপূর্ণ পথে সে বিপ্লব ঘটান সম্ভাবনা হিসাবে রাখে। সেটা নির্ভর করে এক-একটা দেশে শ্রেণী শক্তির মূর্ত-নির্দিষ্ট অনুপাত, মেহনতি জনগণের সংগঠনশীলতা ও পরিপক্বতা, প্রভু শ্রেণীগণুলির প্রতিরোধের মাত্রা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কী রূপ নিয়ে ঘটছে, তা নির্বিশেষেই তার প্রধান মর্ম থেকেই যায় মেহনতিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। যেমন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে (রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব, ১৯৫৯ সালে কিউবায় বিপ্লব), তেমনি শান্তিপূর্ণ পথেও (পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি দেশে) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটান দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসে।

কমিউনিস্টরা বিপ্লব চায় শান্তিপূর্ণ পথে, কেননা সেটা জনগণের সর্বাধিক স্বার্থসম্মত, তাতে সম্ভব হয় বলিদান, ধ্বংসকান্ড, দুর্দশা এড়ানো। কিন্তু বিপ্লব সাধনের রূপ নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণী, মেহনতি জনগণ স্বাধীন নয়: শোষক শ্রেণীরা যখন জনগণের ওপর

বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়, তখন অন্য সম্ভাবনাটা — সমাজতন্ত্রে অশান্তিপূর্ণ পথে উৎক্রমণটা কাজে লাগানো আবশ্যিক। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে শ্রেণীসংগ্রাম চালাবার সমস্ত রূপ ও পদ্ধতির ওপর দখল, এক-একটা দেশের মূর্ত-নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির সৃজনধর্মী প্রয়োগ হল প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির সফল ফ্রিয়াকলাপের শর্ত।

সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রভুত্ব ও অধীনতার যেসব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে দেখা দিয়েছে এক-একটা জাতির বিকাশে অসমানতা। তার ভিত্তিতে লেনিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব প্রথমে একটা বা কয়েকটা দেশে। তিনি মনে করতেন যে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটা উচিত পুরো একটা ঐতিহাসিক যুগ নিয়ে, তার বিকাশের গতিপথে এক-একটা বা কয়েকটা করে দেশ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে খসে গিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথ নেবে। এতে পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার কোনো একটা অংশে, কোনো একটা অঞ্চলে বৈপ্লবিক ঝাঁকুনি অবশ্য-অবশ্যই প্রতিফলিত হবে পুঁজিতন্ত্রের গোটা বিশ্বব্যবস্থাতেই।

প্রতিটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত পেকে ওঠে যেমন তার ভেতরকার, তেমনি বাইরেরকার বিরোধগুলির বিজড়নের ফলে আর সেক্ষেত্রে সেগুলির সর্বাধিক তীব্রায়ণ যে অবশ্যই ঘটবে সবচেয়ে বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে এমন নয়। যেমন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথম জয়লাভ করল পুঁজিতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত

কম বিকশিত একটি দেশে, রাশিয়ায়। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনে এগিয়ে গেল যেমন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শ্রমিক শ্রেণী তেমনি উপনিবেশ আর পরাধীন দেশগুলির জনগণও।

বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের শর্ত বিভিন্ন। বিপ্লব সাধনে জাতীয় পার্থক্যের নির্ধারক কারণ বলে লেনিন মনে করতেন পুঁজিতন্ত্র বিকাশের মাত্রা: ‘...পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ কল্পনীয় বিভিন্ন রূপে, সেটা নির্ভর করে দেশে ইতিমধ্যে বৃহৎ পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে, নাকি প্রাধান্য করছে ক্ষুদ্র অর্থনীতি, তার ওপর।’* লেনিন মন্তব্য করেছেন, বেশি পশ্চাৎপদ পুঁজিতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব শুরুর করা সহজ, কিন্তু সমাজতন্ত্র নির্মাণ করা বেশি কঠিন, কেননা, ‘এখানে ধ্বংসের কাজটার সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন অশ্রুতপূর্ব রকমের কঠিন আরো বহুকাজ, যা সাংগঠনিক’।** এবং পক্ষান্তরে, দেশটা যত বেশি সুবিকশিত, ততই সেখানে বৈপ্লবিক ওলটপালট শুরুর করা ও ঘটানো কঠিন, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিজয়ী পরিণামে পৌঁছে দেওয়া ততই সহজ।***

বর্তমান বৈপ্লবিক বিকাশের একটা নতুন ব্যাপার হল

* Lenin V. I. *Collected Works*, 1973, Vol. 32, p. 233.

** Lenin V. I. *Collected Works*, 1977, Vol. 27, p. 89.

*** Ibid., p. 547.

ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত দেশগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে দ্রুতবর্ধমান প্রবণতা। বিকাশের পুঞ্জিতান্ত্রিক পর্যায় এড়িয়ে প্রাক্-পুঞ্জিতান্ত্রিক অথবা আদি-পুঞ্জিতান্ত্রিক সম্পর্ক থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশগুলির পক্ষ থেকে পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে সাহায্য দিতে পারায়।

বর্তমানে যখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহমিতালি বিদ্যমান, তখন সমাজতন্ত্রমুখী অপুঞ্জিতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত জাতিগুলির সংগ্রামে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত। তবে বিকাশের অপুঞ্জিতান্ত্রিক পথ হল ঐতিহাসিকভাবে আবশ্যিক একটা পর্ব, যার গতিপথে গড়ে ওঠে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিষ্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। সমাজতন্ত্রে ‘তৎক্ষণাৎ’ উত্তরণ, অর্থাৎ তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিনাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের প্রয়াস একটা রাজনৈতিক হঠকারিতা, যা বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষতি করতেই পারে।

ইউরোপ, এশিয়ার একসারি দেশে এবং কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, পুঞ্জির দেশগুলিতে কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার, নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সমাজতন্ত্রমুখিতা — এই সবকিছু থেকেই দেখা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন, তার বৈজ্ঞানিক সূর্যসিদ্ধি ও প্রাণশক্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গতিপথে যে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা জন্ম নেয়, নিজের অন্তঃসারের দিক থেকে তা পূর্বতন সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নীতিগতভাবে পৃথক।

কমিউনিস্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্ক্সবাদী ধারণা কড়াকড়ি বৈজ্ঞানিক। সেটা এসেছে পূর্ববর্তী বাস্তবে বিদ্যমান পুঞ্জিতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের প্রবণতা ও নিয়মবদ্ধতাগুলির বিশ্লেষণ থেকে। লেনিন লিখেছেন, ‘মার্ক্সের মধ্যে ইউটোপিয়া রচনার, যা জানা সম্ভব নয়, সেটা স্রেফ আন্দাজ করার চিহ্নমাত্র নেই। কমিউনিজমের প্রশ্ন মার্ক্স সেইভাবে রেখেছেন, যেভাবে ধরা যাক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী রাখেন একটা নতুন, ভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ উদ্ভবের প্রশ্ন।’*

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 25, p. 463.

লোকের খাওয়া, পরা, কাজ করা, সময় কাটানোর একটা বিশদ ছক দাঁখিলের সঙ্গে নতুন সমাজের বৈজ্ঞানিক ধারণার কোনো মিল নেই। এ তত্ত্বে উদ্ঘাটিত করা হয় সামাজিক জীবনে যা প্রধান — তার বিকাশের মূলগত দিক, নিয়ম আর প্রবণতা।

এই কথাটায় জোর দেওয়া দরকার: নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে ইতিমধ্যেই যেসব জনগোষ্ঠী সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে, তাদের জীবন অনুধাবনের ফলে। সমাজের ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মে যাকিছু পরীক্ষিত ও প্রতিপাদিত, সেগুলির সামান্যীকরণ করে নিয়ে আসা হয় কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার তত্ত্বে। সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে নেমে প্রতিটি দেশ নিজস্ব কিছুর একটা এনে দেয় এবং তাতে করে নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণাকে পুষ্ট করে। এরূপ দেশ হবে যত বেশি, কমিউনিজম বিষয়ক বিজ্ঞানও হবে ততই সমৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হল সৃজনধর্মী মতবাদ। তা বেড়ে ওঠে খোদ জীবনেরই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কেননা জীবন থেকেই তার জন্ম, বাস্তব ঘটনাদির সঙ্গে কদম মিলিয়ে তা চলে, তা থেকে ঠিক ততটা এগিয়ে থাকে, যতটায় সামনের পথ আলোকিত করা যায়।

নতুন ব্যবস্থাটা অনড়, অপরিবর্তনীয় কিছুর নয়। বরং উলটো, তার জন্মমুহূর্ত থেকেই শুরু হয় সমাজজীবনের সব দিক বিকাশের গতিশীল প্রক্রিয়া।

কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী?

সভ্যতার সর্বোচ্চ ধাপ

প্রতিটি সমাজেরই মূল্যায়ন করা যায় যে লক্ষ্য তা সামনে রেখেছে, তার চরিত্র ও মর্ম বিচার করে। লক্ষ্য থেকেই নির্ধারিত হয় তা অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি। সমাজ যদি সমস্ত মেহনতির সচ্ছলতা বিধানে, তাদের আত্মিক ও শারীরিক বিকাশে সচেষ্টি থাকে, তাহলে সে লক্ষ্য সিদ্ধ করার উপায়ও হওয়া উচিত সমান মানবিক। পক্ষান্তরে, লক্ষ্য যখন হয় অল্প কয়েকজনের হাতে ধন সঞ্চার, তখন প্রযুক্ত হয় শোষণের অমানুষিক সব পদ্ধতি।

নতুন সমাজব্যবস্থা কী লক্ষ্য রাখছে তার সামনে? কেন তার রূপায়ণ একটা সামাজিক অপরিহার্যতা? কিভাবে এ লক্ষ্য সিদ্ধ হয়?

কমিউনিজমের চরিত্র বর্ণনায় মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন, 'তার শ্রেণী ও শ্রেণীগত বৈপরীত্য নিয়ে পুরনো বুর্জোয়া সমাজের জায়গায় আসে এমন সমিতি, যেখানে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ হল সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।'*

নতুন সমাজের প্রধান, সর্বোচ্চ লক্ষ্য প্রসঙ্গে লেনিনও বলেন যে সেটা হল সমাজের সমস্ত সভ্যতার পরিপূর্ণ সচ্ছলতা আর অবাধ সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। কমিউনিস্ট ব্যবস্থা, তার উৎপাদনের ধরন প্রকৃতিগতভাবেই এমন

* Marx K., Engels F. *Collected Works*, 1976, Vol. 6, p. 506.

যে তা দাবি করে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। সেই কারণেই নতুন সমাজব্যবস্থা জন্মলাভ করা মাত্রই কর্তব্য নয়: সমস্ত মেহনতির জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে, প্রতিটি নাগরিকের দৈহিক ও আত্মিক উন্নয়নে সাহায্য করতে হবে।

জটিল ও বহুমাত্রিক এই কর্তব্যটা সাধিত হয় তৎক্ষণাৎ নয়, ক্রমে ক্রমে, প্রয়োজনীয় বৈষয়িক, প্রকৌশলিক, সামাজিক ও আত্মিক শর্ত গড়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে। অন্যভাবে ভাবার অর্থ ইউটোপিয়ায় পতিত হওয়া, শুভ কিন্তু অবাস্তব কামনায় ভেসে যাওয়া। উক্ত লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে প্রয়োজন সমাজজীবনের সমস্ত দিকের আমূল পুনর্গঠন আর তার জন্য দরকার সময় এবং কোটি কোটি লোকের প্রয়াস।

গোটা সমাজের জন্য একই লক্ষ্য রাখা সম্ভব কেন?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সামাজিক উৎপাদনের উপায়কে পৃথক পৃথক ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে পরিণত করে সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে। সুতরাং অধিবাসীদের বড়ো বড়ো গ্রুপ, শোষক ও শোষিতদের মধ্যে স্বার্থের বৈপরীত্য বিলুপ্ত হয়। পূর্জিতন্ত্রের পরিস্থিতিতে বর্জ্যের কাছে যেটা লাভজনক — মদ্যখা অর্জন, ধনবৃদ্ধি — সেটার সর্বনাশা প্রভাব পড়ে সমস্ত স্তরের মেহনতিদের অবস্থায় যাদের স্বার্থ মূলত একইরকম। মেহনতি লোকেদের চাহিদা আর স্বার্থের এই মিল বেড়ে উঠতে থাকে নতুন সমাজ গঠনে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে। তার ফলেই সম্ভব হয় সবার পক্ষে সমান লাভজনক একই

লক্ষ্যাদি রাখা এবং সচেতনভাবে তা অর্জনের জন্য সমাজের সমস্ত নাগরিককে টানা।

শোষণের বিলোপ এবং লোকেদের মধ্যে সমস্ত শ্রেণীগত পার্থক্যের ক্রমশ অন্তর্ধানের ফলে সমাজের পক্ষে কেবল যে একই লক্ষ্য — প্রতিটি মানুষের সচ্ছলতা ও সর্বাত্মক বিকাশ — রাখা সম্ভব হয়, তাই নয়। শ্রেণী আর সামাজিক গ্রুপে লোকেদের ভাগাভাগির মানে কী? তার মানে বিভিন্ন শ্রেণী আর সামাজিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা যে বৈষয়িক নিশ্চিতি আর বিকাশের দিক থেকে অসমান অবস্থায় থাকে সে তো জানা কথা। তাই নতুন সমাজব্যবস্থা কেবল শোষণ শ্রেণীকেই উচ্ছেদ করে না। সুসঙ্গতরূপে তা অবিরাম দূর করতে থাকে সমস্ত শ্রেণীগত প্রভেদ, চেষ্টা করে সামাজিক একরূপিতার, যাতে জীবনযাত্রা, শ্রম, শিক্ষা, বিশ্রাম, চিকিৎসাবিনোদনের একইরকম অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে ওঠে সবার জন্য। এ প্রক্রিয়া চলে কেবল সমাজতন্ত্রে। শ্রেণীগতুলির মেরুপ্রান্তিক ব্যবধান আর অমানবিক লক্ষ্যের বাহক বর্জ্যো সমাজ থেকে নতুন সমাজের নীতিগত পার্থক্য এইখানেই।

নতুন সমাজে শ্রেণীগতুলির কাছিয়ে আসা আর লোকেদের মধ্যে শ্রেণীগত প্রভেদের বিদূরণ কি একটা স্বাধীন প্রক্রিয়া, নতুন সমাজে অন্যান্য পরিবর্তনের ওপর যা নির্ভর করে না? অবশ্যই নয়। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পরিবর্তনের প্রধান কারণ নিহিত বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের ধরনে বিকাশের মধ্যে। সামাজিক একরূপিতার দিকে গতি নিশ্চিত হয়

সর্বাগ্রে উৎপাদন শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের উন্নয়নে। তাই অর্থনীতির অগ্রগতি, তার ভিত্তিতে শ্রম ও উৎপাদনের সামাজীকরণের অগ্রগতি হল কমিউনিস্ট সমাজ রূপলাভের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মবদ্ধতা। এ অগ্রগতি নিশ্চিত হয় একত্রে যৌথ শ্রমে, সমস্ত মেহনতির প্রয়াসে। তারা বোঝে: সামাজিক উৎপাদন হবে যত ফলপ্রসূ, ততই ভালোভাবে তারা থাকবে, ততই পুরোপুরি মিটবে তাদের চাহিদা।

তবে কেবল অর্থনৈতিক বিকাশের সাহায্যেই মূলগত সামাজিক কর্তব্য সাধন সম্ভব নয়। সমস্ত লোকে যাতে খাটতে, পড়তে, বিশ্রাম নিতে, দেহে মনে সুবিকশিত হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য সাধারণ ও পেশাগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরচর্চা ও ক্রীড়া, সামাজিক ভরণপোষণ, সার্বিস ইত্যাদির ব্যবস্থা বিকশিত করা প্রয়োজন। তাই নতুন, কমিউনিস্ট ব্যবস্থার রূপলাভ ও বিকাশের বৈশিষ্ট্য হল শুদ্ধ অর্থনীতি নয়, সমাজজীবনের অন্য সমস্ত দিকেরও বিকাশ। এটাও সমাজতন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে মূলগত পার্থক্য।

কেমন করে, কী উপায়ে নতুন সমাজ তার লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টিত? সর্বাগ্রে, সেটা হল খোদ মেহনতি জনগণেরই ক্রিয়াকলাপ। এ ক্রিয়াকলাপ সচেতন চরিত্রের। নতুন সমাজের মানুষ যে কাজেই নিরত থাকুক, নিজের সামর্থ্য, প্রবণতা, গুণকে অব্যাহত করে। শ্রম পরিণত হয় মানুষের প্রাথমিক চাহিদায়।

জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও প্রতিটি মানুষের বিকাশকে নিজের কর্তব্য বলে ধরে নতুন সমাজ। কিন্তু কাজটা

যেহেতু বিপুল আর জটিল, তাই তার সম্পাদন সম্ভব যদি কেবল এ কর্তব্যের সচেতন পালনে আকৃষ্ট হয় সমস্ত লোক। মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা বৃদ্ধির নিয়ম আবিষ্কার করেন, সেটা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার পরিস্থিতিতে। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, 'ঐতিহাসিক ক্রিয়ার আমূলতার সঙ্গে সঙ্গে, স্ফুটনাং বাড়তে থাকবে জনগণের পরিমাণ, যাদের সেটা কাজ।'* এ নিয়মটাকে লেনিন বলেছেন মার্কসবাদের একটা অতি প্রগাঢ় বস্তু। তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক ক্রিয়াটা হবে যত ঢালাও, যত বেশি হয় তার প্রসার, ততই বেশি সংখ্যক লোক তাতে অংশ নেয়, পক্ষান্তরে যে পুনর্গঠন আমরা চাই, তা যত গভীর ততই বেশি করে জাগাতে হবে তাতে আগ্রহ আর সচেতন মনোভাব, লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি নতুন লোককে তার আবশ্যিকতায় নিঃসন্দেহ করে তুলতে হবে।'***

সমাজতন্ত্রের সামনে অবজেক্টিভ ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের অন্তঃসার আর চরিত্র দিয়েই নির্ধারিত হয় সত্যকার জনক্ষমতার নীতি যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পরই সঙ্গতি সহকারে রূপায়িত হতে থাকে বাস্তবে। সমাজকে, জনগণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে ভালো কে চালাতে পারে ঐ জনগণেরই

* Marx K., Engels F. *Collected Works*, Vol. 4, p. 82.

** Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 31, p. 498.

প্রতিনিধিরা ছাড়া? সাফল্যের একটা বাধ্যতামূলক শর্ত হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সুসঙ্গত বিকাশ, রাষ্ট্র ও সমাজের পরিচালনায় ক্রমেই বেশি সংখ্যক লোকের যোগদান। এই সমস্যা সমাধানেই নিয়োজিত নতুন ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রথা।

এই জটিল ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়াকে চালাতে পারে কেবল তেমন পার্টি বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সশস্ত্র এবং সে তত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলিকে রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে রূপায়িত করে। মার্কসবাদী পার্টিগুলি হল এই ধরনের পার্টি।

নতুন সমাজের রূপলাভ ও বিকাশ

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও দিকগুলি কার্যকৃত হয় ক্রমে ক্রমে, নতুন ব্যবস্থা যত রূপলাভ করতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে। যেকোনো দেহসত্তা তথা সামাজিক দেহসত্তা বিকশিত হয় ক্রমে ক্রমে, সঙ্গতি অনুসারে। কমিউনিস্ট ব্যবস্থাও এগোয় নিয়মবদ্ধতায়, বিকাশের নিম্ন থেকে উচ্চ আর সুসম্পূর্ণ ধাপে।

বিকাশের কয়েকটা ধাপ সমাজ একলাফে পেরিয়ে যেতে পারে না, শিশু যেমন মূহূর্তেই পারে না বয়স্ক মানুষ হয়ে উঠতে, তাকে যেতে হয় কৈশোর, তারুণ্যের মধ্যে দিয়ে। সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশে কঠোর ধারাবাহিকতার কারণ কী? কারণ প্রতিটি নতুন পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিমিত্ত, পূর্বশর্ত গড়ে ওঠে পূর্ববর্তী পর্ব দ্বারা। প্রতিটি পর্যায়ে অবজেকটিভ

পরিস্থিতি বিচার করে নির্ণয় করা দরকার মেহনতিদের
কী প্রয়োজন, উপযুক্ত লক্ষ্য ও কর্তব্য রাখতে হয়
সমাজের সামনে, রচনা করা দরকার তা বাস্তবে পরিণত
করার কর্মসূচি এবং অব্যাহত করতে হয় জনগণের
ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপ।

সমাজতন্ত্রের নির্মাতা জনগণের অস্ত্র হল কমিউনিস্ট
ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তত্ত্বের দিক থেকে প্রতিপাদিত
এবং বহু দেশের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত
হয়েছে যে নতুন ব্যবস্থা বিকশিত হয় নিম্নোক্ত মূলগত
পর্যায়গুণ দিগে: ১) পদ্ধতিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে
উৎক্রমণের পর্ব; ২) প্রথম পর্যায় হিশেবে সমাজতন্ত্র;
৩) উচ্চতম পর্যায় হিশেবে কমিউনিজম। তাদের
প্রত্যেকটিও কয়েকটা ধাপে বিভক্ত। এগুণের একটা
থেকে অন্যটায় পার্থক্য আছে, কিন্তু সাধারণ দিকও
আছে প্রচুর, কেননা এটা একই সমাজব্যবস্থা, কমিউনিস্ট
ব্যবস্থার ধাপগুণের মধ্যে পার্থক্য।

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বিকাশে এই পর্যায়গুণ হল
নিয়মসঙ্গত ধাপ। একথা ভাবা উচিত নয় যে
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক পরেই তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্র
নির্মিত হয়ে গেল — সেটা নির্মিত হয় উৎক্রমণ পর্বের
প্রক্রিয়ায়। ঠিক একইভাবে কমিউনিজমে পৌঁছনো যায়
না সমাজতন্ত্র নির্মাণের দীর্ঘ ঐতিহাসিক একটা অধ্যায়
ছাড়া। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবাদর্শীয়

প্রতিপক্ষীয়রা সমাজতন্ত্রকে হেয় করার ফন্দি হিশেবে
তার কাছে এমন সব চড়া দাবি করে যা কেবল নতুন
ব্যবস্থার উচ্চ পর্যায়েই মেটানো সম্ভব। বৈজ্ঞানিক

কমিউনিজমের তত্ত্ব নতুন সমাজের উচ্চ পর্যায়ের আরোহণের যে প্রক্রিয়া, তার ধারাবাহিকতা দেখিয়ে তার বিকাশের প্রতিটি পর্বের বাস্তব সম্ভাবনা খুলে ধরে। তাতে করে তা লোকেদের মদ্য ফেরায় সামাজিক আদর্শের ব্যবহারিক রূপায়ণের দিকে, মানবিক, শোষণ-ও পীড়নমুক্ত সমাজের জন্মগ্রহণ ও রূপলাভের সঙ্গে যেসব মোহ আর মিথ্যা দোষারোপ জড়িয়ে থাকে, সেগুলো ঝেঁপেটিয়ে সাফ করে।

কৃগ্রিম অতিরঞ্জন অথবা তার শ্রেষ্ঠত্বে কালিমালেপন, কিছুই প্রয়োজন নেই নতুন সমাজব্যবস্থার। ধারাবাহিকতায়, অবিচলে তা বিকশিত হচ্ছে, একটা ধাপ থেকে অন্য ধাপে উঠে যাচ্ছে, মেলে ধরছে জীবনযাত্রার উন্নয়ন, প্রতিটি মানুষের বিকাশ ও সচ্ছলতা বৃদ্ধির নতুন নতুন সম্ভাবনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্ব

উৎক্রমণ পর্বের অপরিহার্যতা

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার রূপলাভের বৈশিষ্ট্য হল এই যে বিপ্লবে জন্মগ্রহণ করে নতুন ব্যবস্থা পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা উৎক্রমণ পর্বের মধ্যে দিয়ে যায়। একটা ব্যবস্থার অন্যটায় পরিবর্তনের কথা ইতিহাসে জানা আছে, যেমন সামন্ততান্ত্রিকের পুঁজিতান্ত্রিকে। কিন্তু তখন উৎক্রমণ পর্বের প্রয়োজন হয় নি। কেন? কারণ সামন্ততন্ত্র আর পুঁজিতন্ত্রের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক, প্রধান ব্যাপারটায় তাদের মিল ছিল — দুটোই শোষণ ব্যবস্থা। উভয়ই প্রতিষ্ঠিত একদল লোকের কাছে অন্য দল লোকের দাসত্ব ও পীড়নের ওপর যদিও সেটা চলে বিভিন্ন রূপে।

বুর্জোয়া বিপ্লবে দেশে সামন্তদের জায়গায়

আসে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা, সমাজে শ্রেণী বৈর বজায় থাকে। পুঁজিতন্ত্রের জায়গায় সমাজতন্ত্র এলে কি তেমন কিছু ঘটতে পারে? পারে না, কেননা নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নীতিগতভাবে পুরনোটা থেকে স্বতন্ত্র। তাতে পীড়ন, শোষণের স্থান নেই। তাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর সম্পর্ক জন্ম নিতে ও বিকশিত হতে পারে না পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শোষক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রম অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতি কি চালু করা সম্ভব, মেহনতি আর মালিক বেতন পাচ্ছে তাদের খাটুনির ওপর নির্ভর করে এমন ব্যবস্থা হতে পারে কি? অবশ্যই না।

বিপ্লব সম্পাদন করার পর সমাজতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় সচেতনভাবে। সেই কাজটাই করা হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে, সেটা হল পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্ব।

শোষক শ্রেণীদের, সমস্ত ধরনের পীড়ন চূড়ান্তরূপে বিলোপের জন্যও উৎক্রমণ পর্বের প্রয়োজন হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক-একজন ব্যক্তির বৃহৎ মালিকানা কে পরিণত করে সমগ্র জনগণের মালিকানায়। কিন্তু মালিকেরা মেহনতি জনগণের ওপর তাদের প্রভাব, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে, তাদেরই পক্ষ থেকে বাড়িয়ে তোলা মরুশীলগদুলোর ওপর ভরসা করে চেষ্টা করে ক্ষমতা ফিরে পেতে। পুরনোটা আপনা থেকে, স্বেচ্ছায় অন্তর্ধান করে না। কে জিতবে, সমাজতন্ত্র নাকি পুঁজিতন্ত্র, এই প্রশ্নেই প্রকাশ পায়

উৎক্রমণ পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসে যা দেখা গেছে, শোষণ শ্রেণীগুলির প্রতিরোধের শক্তিকে ছোটো করে দেখলে প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয় মেহনতিদের।

উৎক্রমণ পর্বের কর্তব্য সাধন করা যায় কী উপায়ে? সেটা করা সম্ভব কেবল যদি মেহনতিরা ক্ষমতা নেয় নিজেদের হাতে, স্থাপন করে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য — একনায়কত্ব। এমন নানা তত্ত্ব আছে যাদের উদ্দেশ্য হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সত্যকার কাজকে বিকৃত করে দেখানো, অনভিজ্ঞ লোকেদের মনে ভীতি সঞ্চার করা। লক্ষ্য আর তা অর্জনের উপায়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা তদুপযোগিতা বিদ্যমান। সমস্ত ধরনের পীড়ন, জোরজুলুমের উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কি এমনিতেই একটা মহনীয় ও মানবিক কাজ নয়? তাই এ কর্তব্য সাধনের মূলগত উপায় — মেহনতিদের ক্ষমতাও অমানবিক হতে পারে না। তা নির্মম তাদের ক্ষেত্রে যারা সামাজিক অভিশাপ — পুঞ্জির ক্ষমতা, সুতরাং তার সহগামী সমস্ত দুঃখদুর্দশা বজায় রাখতে চেষ্টিত।

ইতিহাস দেখিয়েছে: প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের দমনমূলক ব্যবস্থাদি হল বাধ্যতাজনিত ব্যবস্থা, প্রতিবিপ্লবী শক্তির নিষ্ঠুরতা, বলপ্রয়োগ আর সম্প্রাসের জবাব।

তাই, পুঞ্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের পর্বটা হল সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ পর্ব। মেহনতিগণ কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয়ে তার শুরুর এবং শেষ হয় তা সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ স্থাপন করে। এরূপ পর্ব যে অপরিহার্য, তার তাত্ত্বিক প্রতিপাদন মার্কস দিয়েছেন

তাঁর 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা'য়। তিনি লিখেছেন, 'পুঁজিতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যে থাকে প্রথমটির দ্বিতীয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তরের পর্ব। উৎক্রমণশীল রাজনৈতিক পর্বটাও হয় এই পর্বের উপযোগী এবং প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক একনায়কত্ব ছাড়া তা অন্য কিছু হতে পারে না।'* বাস্তব জীবনে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই ভবিষ্যদ্বাণী। সেইসঙ্গে, যেটা খুবই স্বাভাবিক, বহু জনগোষ্ঠীর ব্যবহারিক কার্যকলাপে সমৃদ্ধ ও মূর্ত-নির্দিষ্ট হয়েছে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বৈশিষ্ট্য

আমাদের কালে ক্রমেই বেশি সংখ্যক দেশ ও জাতি সমাজতন্ত্রের দিকে চলেছে। কিন্তু দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রশ্ন ওঠে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মবদ্ধতা আছে কি, নাকি আলাদা আলাদা প্রতিটি জাতিকেই যেতে হবে নিজের নিজের পথ ধরে? প্রশ্নটা জটিল এবং তার উত্তরটাও সরাসরি রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব ধরে।

একদল তাত্ত্বিক দেখাবার চেষ্টা করেছেন: সমাজতন্ত্র নির্মাণের একই নিয়মবদ্ধতা নেই, প্রতিটি দেশকেই সমাজতন্ত্র গড়তে হবে তার নিজের মতো করে, কেবল

* Marx K., Engels F. *Selected Works* in three volumes, Vol. 3, p. 26.

তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে। এ থেকে দাঁড়ায় যে একটা দেশে নির্মিত সমাজতন্ত্রকে রীতিমতো পৃথক হতে হবে অন্য দেশের সমাজতন্ত্র থেকে। এ হল ‘সমাজতন্ত্রের জাতীয় মডেলের’ ধারণা। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে যে সমাজতন্ত্র গঠিত হবে, তা কি বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্র থেকে নীতিগতভাবে পৃথক হতে পারে? তার জবাবে বলতে হয়, না। যেমন খোদ সমাজতন্ত্র, তেমনি যেখানেই তা প্রতিষ্ঠিত হোক, তার নির্মাণও চলে সাধারণ নিয়মবদ্ধতা অনুসারে।

তেমনি অন্য যে মতটায় এক-একটা দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের বৈশিষ্ট্য বাতিল করে দেওয়া হয়, এ প্রক্রিয়ার সাধারণ নিয়মবদ্ধতার আত্মপ্রকাশের রূপে বৈচিত্র্য গ্রাহ্য নয়, সেটাও সমান বৈঠক। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্বে এ ধারণা একেবারে বর্জনীয়। প্রতিটি দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে তা দেখে সাধারণ ও বিশেষের আঙ্গিক ঐক্যে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতির কারণ কী? তার কারণ বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিভিন্ন মাত্রা থেকে। প্রতিটি দেশে উৎক্রমণ পর্বের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে যায় জাতীয় পার্থক্য দিয়েও, রাষ্ট্রটির অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে শ্রেণী শক্তির অসম অনুপাত দিয়েও। উল্লিখিত কারণগুলির ফলেই সমাজতন্ত্রের দিকে বিভিন্ন জাতির অগ্রগমনের স্বকীয় রূপ দেখা দেয়।

সেই কারণেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সমাজতন্ত্রের

দিকে নিজ নিজ দেশের এগুবার বৈশিষ্ট্য হিসেবে রাখে, সৃজনশীলতার সঙ্গে খোঁজে সমাজতন্ত্র নির্মাণের সবচেয়ে ফলপ্রদ উপায়। তারা পরিচালিত হয় এই নীতিগত লেনিনীয় নির্দেশে: মার্কসের তত্ত্ব 'দেয় কেবল সাধারণ পরিচালক প্রস্তাব, বিশেষ ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সের চেয়ে অন্যভাবে ইংল্যান্ডে, জার্মানির চেয়ে অন্যভাবে ফ্রান্সে, রাশিয়ার চেয়ে অন্যভাবে জার্মানিতে।'*

সমাজতন্ত্রের দিকে বিভিন্ন দেশের অগ্রগমনের বৈশিষ্ট্য মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যেটা সাধারণ, সেটাকেও দেখতে হবে। সাধারণটায় প্রকাশ পায় সমাজজীবন পুনর্গঠনের প্রধান নির্ধারক দিকটা।

এ শতকের ৫০-এর দশকের শেষাশেষি একসারি সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎক্রমণ পর্ব শেষ হয়। এর ফলে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের নিয়মবদ্ধতার বিশ্লেষণ ও সূত্রায়ণ করা সম্ভব হয় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির পক্ষে। কী সেগুলি? সাধারণ নিয়মবদ্ধতা হয় এই:

— সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন এবং কোনো না কোনো রূপে মেহনতিদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা;

— কৃষকদের মূলাংশ এবং মেহনতিদের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোট;

— উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়গুলির ওপর

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 4, 1977, p. 212.

পুঞ্জিতান্ত্রিক মালিকানার উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা স্থাপন;

— কৃষি জোতের দ্রুত সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর;

— মেহনতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ;

— ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন এবং জনগণের প্রতি, সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠন;

— জাতীয় পীড়নের অবসান এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমাধিকার ও ভ্রাতৃবন্ধন মৈত্রী স্থাপন;

— বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের হামলা থেকে সমাজতন্ত্রের সুরক্ষা;

— অন্যান্য দেশের মেহনতিদের সঙ্গে নির্দিষ্ট দেশটির মেহনতিদের একাত্মতা — প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা।

পুঞ্জিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের এই কাজগুলির চরিত্র সাধারণ।

মেহনতিদের ক্ষমতা এবং তার রূপ

উৎক্রমণ পর্বের বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা — প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। তাতে কী বোঝায়? কী রূপে তা আত্মপ্রকাশ করে?

ক্ষমতার প্রশ্ন হল সমস্ত বিপ্লবের, তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূলগত প্রশ্ন। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার সিদ্ধান্তকে মার্কস এমন একটা আবিষ্কার বলে গণ্য করেছিলেন যা নীতিগত চরিত্র

ধরে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মতবাদকে লেনিন মনে করতেন মার্কসীয় তত্ত্বের প্রাণকোষ।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রয়োজন উৎক্রমণ পর্বে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের হাতিয়ার, যন্ত্র হিশেবে। এটা দরকার সর্বাগ্রে পুঞ্জিতান্ত্রিক মালিকানা উচ্ছেদের জন্য, শোষক শ্রেণীদের প্রতিরোধ, মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগ আরফৎ, দমনের জন্য। শোষক শ্রেণীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা ও রূপ নির্ভর করে শ্রেণী শক্তির অনুপাত, সর্বাগ্রে শ্রেণী শত্রুদের প্রতিরোধের মাত্রার ওপর।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কেবল বলপ্রয়োগেই পর্যবসিত নয়। তার কাজ খুবই বহুমাত্রিক: অন্যান্য মেহনতি স্তরগুলির সঙ্গে জোটবন্ধন ও তার সংহতি, সমাজতন্ত্রের সেবায় বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ, খোদ শ্রমিক শ্রেণী এবং সমস্ত কর্মীদের মধ্যে সচেতন শৃঙ্খলার অভ্যাস গঠন।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রধান কথা বলপ্রয়োগ নয়, গঠনমূলক কাজ, অর্থনৈতিক ও লালনমূলক ক্রিয়াকলাপ, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও উৎপন্ন বস্তু নিয়ে নতুন সম্পর্ক স্থাপন ও তার সুব্যবস্থা। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব এই কাজগুলি করে:

— অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক-লালনমূলক কাজ;

— শোষক শ্রেণীদের প্রতিরোধ দমন;

— সমাজতান্ত্রিক মালিকানা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা;

— শ্রমের পরিমাণ ও পরিভোগের পরিমাণের ওপর নিয়ন্ত্রণ;

— স্বদেশ রক্ষা, অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগণ্ডালির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা বর্ধন।

মেহনতিদের ক্ষমতার রূপ হিশেবে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংস্থাটির পুরো একটা ব্যবস্থা। তার মধ্যে পড়ে: মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি, কমসোমল, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সংগঠন ও স্বেচ্ছাভিত্তিক সমিতি। রাজনৈতিক গঠনের এই ব্যবস্থাই হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা, প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের নীতিগতভাবে নতুন শ্রেণী মর্মার্থ তাকে করে তোলে যেকোনো বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। নতুন রাষ্ট্রের একনায়কত্বমূলক দ্বিম্যাকর্ম চালিত কেবল শোষক অলপাংশের বিরুদ্ধে, আর নতুন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সদুযোগসুবিধা ভোগ করে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী। যেকোনো বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল মেহনতি অধিকাংশের বিরুদ্ধে চালিত বুর্জোয়া একনায়কত্বের একটা রূপ, তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্র হল একটা বাহ্যিক, আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র। অধিকাংশের ক্ষমতা, মেহনতিদের, অর্থাৎ জনগণের ক্ষমতা হওয়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হল সত্যকার গণতন্ত্র।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ পর্বের

অন্তঃসার বোঝার পক্ষে একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের সঠিক বোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই গণতন্ত্রের একটা বৈঠক বোধ চালু করা হয় বর্জোয়া প্রচারে: গণতন্ত্রে বলপ্রয়োগ ও দমনের স্থান নেই। আসলে শোষকদের ওপর জনগণের বলপ্রয়োগই হল জনগণের সত্যকার ক্ষমতা হিসেবে গণতন্ত্রেরই আত্মপ্রকাশ।

অন্তঃসার ও লক্ষ্যের দিক থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব একই। তবে কোনো কোনো দেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের নিম্নোক্ত রূপ আলাদা করা যায়:

- প্যারিস কমিউন;
- সোভিয়েত রূপ;
- জন-গণতান্ত্রিক রূপ।

প্যারিস কমিউন (ফ্রান্স, ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে) পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে দেয়, পুরনো সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ, আদালত তুলে দিয়ে স্থাপন করে নতুন ক্ষমতা, যার ক্রিয়াকলাপে অসঙ্গিভাবে মিলেছিল একই সঙ্গে আইন-প্রণয়ন ও কর্ম-নির্বাহ। পদাধিকারীদের বিশেষ সুবিধা নাকচ করে কমিউন, রাজকার্য চালানো হত শ্রমিকের সমান বেতনে। প্যারিস কমিউনের বৈশিষ্ট্য হল যে তা সশস্ত্র জনগণের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। কমিউনারদের নিয়মিত ফৌজ ও মিলিশিয়া ছিল না, খোদ জনগণই চালাত তাদের কাজ।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অন্য একটা রূপ সোভিয়েত

ইউনিয়নের বৈশিষ্ট্য। এটা হল সোভিয়েত বা জনপরিষদ রূপী ক্ষমতা। তার বৈশিষ্ট্য: প্রথমত এগুন্টির উদ্ভব বর্জোয়া সমাজের সমস্ত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিলোপের সঙ্গে জড়িত; দ্বিতীয়ত, অধিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার ছিল না; তৃতীয়ত, রাষ্ট্রক্ষমতার সংস্থায় শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের মধ্যে খানিকটা অসাম্য ছিল, চতুর্থত, প্রলোভনীয় একনায়কত্বের সোভিয়েত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল একটি পার্টির অস্তিত্ব।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই দেখা দিয়েছে তাঁর শ্রেণী সংগ্রাম, শোষণ শ্রেণীগুণের ক্ষিপ্ত প্রতিরোধের ফলে।

প্রলোভনীয় একনায়কত্বের জন-গণতান্ত্রিক রূপ গড়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরেকার নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, সমাজতন্ত্রের অনুকূলে বিশ্বের সামাজিক-শ্রেণীগত শক্তির অনুপাত ভয়ানক বদলে যায় যখন। এই ঘটনাচক্রে জন-গণতন্ত্রের দেশগুলিতে প্রলোভনীয় ক্ষমতা প্রথম থেকেই শূন্য গরিব চাষিদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জোটের ওপরেই নয়, মাঝারি চাষিদের সঙ্গে জোটের ওপরেও নির্ভর করতে পেরেছিল। এই ঘটনাচক্রে ফলে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে জাতীয় বর্জোয়ার পক্ষ থেকে প্রতিরোধের মাত্রাও হয় কম। জন-গণতন্ত্রের দেশগুলিতে নতুন ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও চিরবিচিত্র সামাজিক ভিত্তির প্রতিফলন ঘটেছে, জন ফ্রন্ট, পিতৃভূমির ফ্রন্ট, জাতীয় ফ্রন্টগুলির মতো রাজনৈতিক সংগঠনাদিতে। কয়েকটি দেশে এইসব সংগঠনে মিলিত হয় সমাজতন্ত্রের

মধ্যে দণ্ডায়মান একাধিক রাজনৈতিক পার্টি, অন্য কয়েকটি দেশে এক পার্টি, কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন। জন-গণতন্ত্রের দেশগুলিতে ভূতপূর্ব প্রভু প্রেরণীগুলির ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয় নি। আরো একটা বৈশিষ্ট্য হল, কয়েকটি দেশে প্রাগ্‌বিপ্লব রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু রূপও কাজে লাগানো হয়, বলাই বাহুল্য, তার মর্মবস্তু আমূল বদলে দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের গুরুত্ব থেকে শূন্য করে উৎক্রমণ পর্ব শেষ হয় সমাজতন্ত্র নির্মাণে। এই সময় থেকে দেখা দেয় কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বিকাশের একটা নতুন, উচ্চতর পর্যায়, আরো পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হতে থাকে তার লক্ষ্য। এই ঐতিহাসিক ধাপটার, বিজয়ী সমাজতন্ত্রের অন্তঃসার কী?

সপ্তম অধ্যায়

সমাজতন্ত্র বিকাশের ধাপ

সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ গঠন

সমাজতন্ত্র হল কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়। আগের অধ্যায়ে পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যে উৎক্রমণ পর্বের কথা বলা হয়েছে, তা থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান আর সমাজের আর্থিক জীবনের দিক দিয়ে এ পর্যায় গুরুগতভাবে পৃথক। সমাজতন্ত্রে সব ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত। কল-কারখানা, রেলপথ, ভূমি, বিদ্যুৎ স্টেশন আর ভূমি, এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উদ্যোগগুলি হয়ে দাঁড়ায় সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা থাকে দুই রূপের রাষ্ট্রীয় আর সমবায়মূলক।

শোষক শ্রেণীদের উচ্ছেদ, কৃষক ও কারুদুর্মীদের সমবায়ভুক্তির ফলে সমাজতান্ত্রিক

সমাজ তার সামাজিক-শ্রেণীগত গঠনের দিক থেকে হয়ে দাঁড়ায় অবৈরগত। তাতে থাকে শ্রমিক শ্রেণী, সমবায়বদ্ধ কৃষক আর মেহনতি স্তর থেকে আগত বুদ্ধিজীবী।

রাষ্ট্র পরিণত হয় একটা সর্বজনীন রাজনৈতিক সংস্থায়, যা প্রকাশ করে সমাজের সমস্ত সত্ত্বের অভিপ্রায় আর স্বার্থ, আর সে সমাজ গঠিত কেবল মেহনতিদের নিয়ে। সমস্ত অধিবাসীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নত হয়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন, সমাজতান্ত্রিক ধরনের সংস্কৃতি, প্রাধান্য করে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা।

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে দেখা দেয় ও বিকশিত হতে থাকে ব্যক্তির নতুন সামাজিক টাইপ, দানা বাঁধতে থাকে পুঞ্জিতন্ত্র থেকে পৃথক জীবনযাত্রার সমাজতান্ত্রিক ধারা। মানবিক নীতির ওপর গঠিত এরূপ সমাজে ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে আশাবাদ, যৌথ মনোবৃত্তি, আন্তর্জাতিকতা।

সমাজতন্ত্র হল মেহনতিদের সমাজ। কর্মক্ষম প্রতিটি নাগরিক তার সামর্থ্য অনুযায়ী সততার সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য। নিয়োজিত শক্তি, জ্ঞান, নৈপুণ্যের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে দাম দেওয়া হয় তার খাটুনির। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি হল 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে'। মাঝে মাঝে নীতিটা ব্যক্ত হয় এই সূত্রে: 'যে খাটে না, তার খাওয়াও চলবে না।' উৎপাদনশীল এবং উৎকৃষ্ট শ্রমের জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিটি লোককে উৎসাহিত করে যেমন বৈষয়িক তেমন নৈতিক সমর্থন

মারফত। এ থেকেই বোঝা যায় শ্রমের পরিমাণ আর পরিভোগের পরিমাণের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখার গুরুত্ব, উচ্চ মাত্রার সংগঠনশীলতা ও শৃঙ্খলার জন্য যে সংগ্রাম চালানো হয় সমাজতন্ত্রে, তার গুরুত্ব।

শোষণক ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে তুলনায় সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রায় দ্রুত ও গুণগত পরিবর্তন। কী তার লক্ষ্য? সমাজতন্ত্রে সমস্ত পুনর্গঠন চলে পরিণামে লোকেদের সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য, প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সেরা পরিস্থিতি গড়ে দেবার উদ্দেশ্যে। তাই মেহনতিরা এইসব পুনর্গঠনে আগ্রহী। সজ্ঞানে ও সক্রিয়ভাবে তাতে যোগ দিয়ে তারা সমাজ বিকাশের গতিবেগ ত্বরণে সাহায্য করে।

সমাজতন্ত্র একটা গতিশীল সমাজব্যবস্থা। লেনিন লেখেন, ‘...কেবল সমাজতন্ত্র থেকেই শুরূ হয় সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে দ্রুত, আসল, সত্যই গণচরিত্রের, অধিকাংশ অধিবাসীদের, পরে সমস্ত অধিবাসীদের নিয়ে, ঘটমান অগ্রগতি।’* সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ পাতার পর তার বিকাশ হয় সুপ্রসর ও সুগভীর। চলতে থাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পূর্ণ করে তোলার প্রক্রিয়া, যারও আবার ধাপ থাকে।

সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণীকরণ

সমাজতন্ত্রের পরিপক্বতার মাত্রা শেষ বিচারে নির্ধারিত হয় মেহনতিদের সচ্ছলতা বাস্তবত কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে,

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 26, p. 330.

কার্যক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত সত্ত্বের সৰ্বাঙ্গীণ বিকাশ কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছে, তাই দিয়ে। জীবনযাত্রার উচ্চ মান এবং প্রতিটি ব্যক্তির সৰ্বাঙ্গীণ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব কেবল প্রয়োজনীয় কতকগুলি বৈষয়িক-টেকনিকাল, অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও আত্মিক শক্তির ভিত্তিতে। অবিলম্বেই এরূপ পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায় না। তার জন্য দরকার সময় এবং সমাজের সমস্ত সত্ত্বের সচেতন, সততাশীল শ্রম।

উৎপাদনের উপায়কে সমগ্র জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করায় ইতিহাসে প্রথম দেখা দিল শিল্প, কৃষি, পরিবহণ, সার্ভিস ইত্যাদিকে পরিকল্পনা অনুসারে, মেহনতি জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থ অনুযায়ী বিকশিত করার সম্ভাবনা। সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে অগ্রগতি চালিত হয় সমাজের সমস্ত সদস্যের চাহিদা আরো মেটানো, তাদের সচ্ছলতা বৃদ্ধির পাকাপোক্ত বৈষয়িক ও আত্মিক ভিত্তি সৃষ্টির জন্য সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের আরো বিকাশের লক্ষ্যে।

পুঁজিতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদন বদ্বর্জোয়ার স্বার্থ ও ইচ্ছার অধীন। মালিক প্রয়োজনীয় মদুনাফা না পেলে বহু উদ্যোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। গদ্বুটিয়ে আসে উৎপাদনের এমনকি গোটাগদ্বুটি এক-একটা শাখা, ফলে কাজ যায় মেহনতিদের। পুঁজিপতিদের মদুনাফার পরিণাম মেহনতি জনগণের অভাব-অনটন। তাই উৎপাদনের উপায়কে সমগ্র জনগণের মালিকানায় তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের পদুনগঠন হয়ে দাঁড়ায় সৰ্বাঙ্গগণ্য সামাজিক আবশ্যিকতা। বিশেষ

করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ সেইসব দেশে যেখানে উৎপাদনী শক্তি উচ্চবিকশিত নয়, দীর্ঘকাল ধরে যারা উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কৃষি-কাঁচামাল উপাসের ভূমিকা নিয়েছে। এইসব দেশের অর্থনীতি বেড়েছে একপেশে হয়ে। তাই সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের গতিপথে দেখা দেব শিল্পের নতুন শাখা সৃষ্টি, কৃষি, পরিবহনের বিকাশ, রেলপথ আর সড়ক, বিদ্যুৎ ও গ্যাস যোজনার প্রয়োজনীয়তা। কৃষি সমবায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলপ্রদতা কেবল তখনই দেখা দেয়, যখন যৌথ খামার পায় যথেষ্ট পরিমাণে ট্র্যাক্টর, হার্ডেস্টার, অন্যান্য কৃষিযন্ত্র, রাসায়নিক সার ইত্যাদি। এ কর্তব্যের সমাধান হতে পারে কেবল সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, বৃহৎ শিল্প, সর্বাপ্তে ভারি শিল্পের পরিকল্পিত বিকাশের ভিত্তিতে।

লেনিন এই কথায় জোর দেন যে ‘আধুনিকতম বিজ্ঞানের শেষ সৃষ্টি অনুরারে নির্মিত টেকনিক ছাড়া, উৎপাদন আর উৎপাদ বণ্টনের একই নিরিখের কঠোর অনুসরণে কোটি কোটি লোককে প্রবৃত্ত করানোর মতো পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ছাড়া’* সমাজতন্ত্র অকল্পনীয়।

সমাজতন্ত্রের ভিত্তি গড়ার পর শ্রেণী ও সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে কী পরিবর্তন ঘটে? যেসব দেশে উৎপাদনের বিকাশ যথেষ্ট উঁচু নয়, সেখানে বেশ দ্রুত বাড়তে থাকে শ্রমিক শ্রেণী, ক্রমেই বেশি সংখ্যক শ্রমিক কাজ করতে শুরুর করে শিল্পের সবচেয়ে আধুনিক

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 32, p. 334.

শাখাগুলোয়। ভালোর দিকে মোড় নেয় শ্রমিক শ্রেণীর জীবন: বাড়ে তাদের সচ্ছলতা, বৃদ্ধি পায় বৃত্তিগত, টেকনিকাল আর সাংস্কৃতিক মান, উন্নত হয় বাসস্থান, জীবনযাত্রার পরিস্থিতি ইত্যাদি।

আমদুল বদলে যায় কৃষকদের জীবন, তার সামাজিক প্রকৃতি, কৃষকের খাটুনি হয়ে দাঁড়ায় অন্যরকম। একা-একা, হাড়ভাঙা, দুর্বির্ষহ মেহনত থেকে তা পরিণত হয় যন্ত্রের সাহায্যে যৌথ পরিশ্রমে। গড়া হয় স্কুল, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, ক্লাব। যৌথ মনোবৃত্তিকে জায়গা ছেড়ে দেয় ব্যক্তিস্বাভাব্য। ব্যাপক সামাজিক স্বার্থ নিয়ে দিন কাটাতে শুরু করে কৃষকেরা, ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করে বিজ্ঞান, সংস্কৃতির সৃষ্টি, বাড়িয়ে তোলে নিজেদের শিক্ষার মান।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পুরোপুরি গড়ে ওঠে মেহনতি শ্রমিকগুলি থেকে, হয়ে দাঁড়ায় সত্যকার জনধর্মী। ক্রমাগত বাড়ে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে সৃষ্টি কঠিন কাজ হাতে নেয়, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি সৃষ্ট এবং জনগণের অনুগত বিশেষজ্ঞ বাহিনী ছাড়া তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও সুসম্পূর্ণ হতে থাকে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র পরিণত হয় সর্বজনীন রাষ্ট্রে, সমাজের সমস্ত সদস্যের স্বার্থ যা পূরণ করে। বেড়ে ওঠে শ্রমিক জনক্ষমতার সংস্থাগুলিরই নয়, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব সংঘ, সৃজনী সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ভূমিকাও। প্রসারিত হয় প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার আর কর্তব্য।

সমাজের সম্মুখস্থ কর্তব্য হয়ে ওঠে যত জটিল ও বিপদুল, ততই বেড়ে ওঠে শাসক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির ভূমিকা আর দায়িত্ব। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ করার মূল লক্ষ্য হল সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারাদির পরিচালনায় ব্যাপক মেহনতি জনগণকে টেনে আনা। সমাজতন্ত্র গড়া হয় কেবল মেহনতিদের জন্যই নয়, তাদের দ্বারাই।

তবে দেশ শাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ সম্ভব যখন সবাই তারা নির্দিষ্ট খানিকটা জ্ঞান ও সংস্কৃতির অধিকারী। সচেতন হয়ে নতুন জীবন গড়তে হলে হওয়া দরকার সর্বপ্রায়ে সাক্ষর, শিক্ষিত লোক। অন্যথায় যা ঘটছে তার বাহ্যবিচার করা, নতুন ব্যবস্থার সমস্ত তাৎপর্য, পুঞ্জিতন্ত্রের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা মেহনতিদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা যে জনগণের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতার ওপর ভরসা করে, তাদের তমসাচ্ছন্নতাকে কাজে লাগায় নিজেদের স্বার্থপর উদ্দেশ্যে নতুন সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সেটা অকারণে নয়। জনগণের আত্মিক বিকাশ ছাড়া সমাজতন্ত্র অকল্পনীয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক পরেই যেখানে নিরক্ষরতা দূর করে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়, সেখানে তার পরবর্তী পর্বে রাখা হয় উচ্চতর লক্ষ্য। কথাটা তখন প্রতিটি নাগরিকের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে। বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা সুসম্পূর্ণ হয়, গড়া হয় বিভিন্ন ধরনের স্কুল, শিক্ষায়তন, টেকনিকাল কলেজ, উচ্চ শিক্ষায়তনের

একটি বিস্তীর্ণ জাল। প্রতিটি মানুষই যাতে ক্রমেই বেশি করে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিল্পকলার চর্চায় যোগ দিতে পারে, তার জন্য করা হয় বহুদিকিছু।

উল্লিখিত পদনগঠনাদির ফলে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের যথাসাধ্য ও সর্বাঙ্গীণ সুসম্পূর্ণীকরণের সম্ভাবনা। এই সুসম্পূর্ণীকরণের ফলে দেখা দেয় সমাজের গুণগতভাবে নতুন একটা অবস্থা — পরিপক্ব অথবা লেনিননের কথায়, ‘অখণ্ড সমাজতন্ত্র’, যাতে পূর্ণীকারে অব্যাহত হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব। পরিপক্ব সমাজতন্ত্র সরাসরি পরিবর্ধিত হয় কমিউনিজমে।

সামাজিক আদর্শ ছাড়া মানবজাতি বিকশিত হতে পারে না। পরিপক্ব সমাজতন্ত্র হল এমন একটা সামাজিক আদর্শ যা তত্ত্বে প্রতিপাদিত, বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ যা বাস্তবে কার্যকৃত করছে। তা দেখাচ্ছে যে শত্রু শক্তির প্রতিরোধ সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র অবিচলে বিকশিত হচ্ছে, বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে পুঞ্জিতন্ত্রের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব, তা সাহায্য করছে সেই নতুন সমাজের জন্য মেহনতিদের সংগ্রামের ফলপ্রদতা বৃদ্ধিতে, যা হল সামাজিক অগ্রগতির শিখর।

সারা বিশ্বের সামনে কমিউনিস্টরা সুনির্দিষ্টরূপে বলে বাস্তব সমাজতন্ত্র কী জিনিস। তারা শুধু তার কৃতিত্ব আর সাফলাই দেখায় না, তার উচ্চ পর্যায়ে যাবার পথে কী কী সমস্যার সমাধান করতে হবে, সে কথাও বলে। এক্ষেত্রে প্রধান কথা হল নতুন ব্যবস্থার যা মানবিক মূলনীতি, ‘সবকিছু মানুষের নামে, সবকিছু

মানুষের কল্যাণের জন্য', সেটাকে আরো পূর্ণাঙ্গ করে
জীবনে রূপ দেওয়া। এই নীতি কার্যকৃত করার লক্ষ্যে
চালিত সমাজের সমস্ত পুনর্গঠন।

পুঞ্জিতন্ত্রের নাকি চরিত্র বদলাচ্ছে, পরিণত হচ্ছে
'সর্বজনীন সৌভাগ্যের সমাজে' — এমন একটা কল্পকথা
বানিয়েছে বুদ্ধজ্যোতিষ ভাবাদর্শীরা। তবে শ্রমজীবীদের
জীবন উন্নয়নে পুঞ্জিতন্ত্রের সামর্থ্য বিষয়ে কোনো
মোহের অবকাশ রাখে না বাস্তব ঘটনাবলি। যেমন,
বহুবিজ্ঞাপিত মার্কিন 'সর্বজনীন সৌভাগ্যের সমাজে'
গৃহহীনদের সংখ্যা ৩০ লক্ষাধিক। কেবল সরকারি
তথ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মক্ষম প্রতিটি ১৩শ ব্যক্তি
বেকার আর ট্রেড ইউনিয়নের হিসেবে বেকার প্রতি
৬ষ্ঠ জন। 'দারিদ্র্য সীমার' নিচে দিন কাটায় সাড়ে তিন
কোটি আমেরিকান। মার্কিন সংবাদপত্রের তথ্য অনুসারে
দেশে বারোমাসে খাদ্যাভাবে ভোগে ২ থেকে ৪ কোটি
লোক। শহরগুলোর রাস্তায় ঘোরে ১০ লক্ষাধিক হাঘরে
শিশু।

অন্য অনেক জরুরি সমস্যারও সমাধান করতে পারে
না পুঞ্জিতন্ত্র, নিরক্ষরতা দূরীকরণ তার একটি।
পশ্চিমী সংবাদপত্রের তথ্য অনুসারে ইউরোপীয়
অর্থনৈতিক পরিমেলের ২৭ কোটি নাগরিকের মধ্যে
প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষই নিরক্ষর অথবা সামান্য সাক্ষর।
আর এ তো সুবিদিত যে সোভিয়েত ইউনিয়নে এইসব
সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বহুদিন। বর্তমানে
সমাজতন্ত্রকে সর্বাদিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ করার পথ নিয়ে
সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। — কথাটা

এখন পরিপূর্ণ সচ্ছলতা আর সমাজের সমস্ত সভ্যতার
অবাধ সর্বাঙ্গীণ বিকাশ* অর্জন করার দিকে অনেকটা
এগিয়ে যাওয়া নিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির
একত্র প্রয়াসে গড়া হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ
সুসম্পূর্ণীকরণের তত্ত্ব। একদিকে এ তত্ত্ব নির্ভর করে
বাস্তব ক্রিয়াকলাপের ওপর, তার সামান্যীকরণ করে,
অন্যদিকে তা এগিয়ে আসে সে ক্রিয়াকলাপের কর্মসূচি
হিসেবে। কর্মসূচি হিসেবে তাতে কেবল ভবিষ্যৎ ও
বর্তমান লক্ষ্যই নিবদ্ধ হয় না, তা অর্জনের উপায়,
পদ্ধতি, পথও নির্দিষ্ট হয়। এই দিক থেকেই, সোভিয়েত
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দলিলাদিতে যা দেখানো
হয়েছে, দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ দ্বরণের
কথাটা এসেছে। কী তার বৈশিষ্ট্য, মূর্ত-নির্দিষ্ট কী
ধরনের কাজ তার করার কথা, তাই নিয়ে এবার
আলোচনা করব।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বরণ — সমাজতন্ত্র সুসম্পূর্ণ করার পথ

পুঞ্জিতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্র বিকশিত হয় উচ্চতর
গতিবেগে। নতুন ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে
তার বিকাশের প্রথম ধাপগুলিতেই। কিন্তু বিশেষ
পূর্ণীকারে তা কার্যকৃত হয় যেখানে সমাজতন্ত্র তার
বৈশিষ্ট্য পরিণত রূপে পৌঁছেছে। বিকাশের উচ্চ হার

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 6, p. 52.

হল ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রেণীবৈবের উচ্ছেদ, সামাজিক অগ্রগতির পথে অন্যান্য প্রতিবন্ধক দূর করার ফল। সমাজতন্ত্রে প্রতিটি লোকের মধ্যে ক্রমেই এই চেতনা সঞ্চারিত হতে থাকে: যত ভালো করে সে খাটবে, ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করবে, যত সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারাদির সিদ্ধান্তে, ততই ভালোভাবে দিন কাটবে তার। ইতিহাস তর্কাতীত রূপে দেখাচ্ছে: যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমন সবখানেই আমূল বদলে যাচ্ছে মেহনতি জনগণের অবস্থা।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে বর্তমানে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব হয়েছে প্রধান কর্তব্য হিসেবে সামনে রাখা — সারা দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের প্রথম স্তর। কেবল এই পথেই ইতিহাসের দিক থেকে স্বল্প কালের মধ্যে পরিণত সমাজতন্ত্রের শিখরে পৌঁছনো এবং তাতে করে কমিউনিজমের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়া সম্ভব।

সোভিয়েত সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ স্তরের কাজ হল সমাজজীবনের সমস্ত দিকের গুণগত সংস্কার (পুনর্গঠন)।

সর্বাপ্রাণে প্রশ্নটা হল বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সূক্ষ্মতার ভিত্তিতে সমাজের বৈষয়িক-টেকনিকাল বনিয়াদের আমূল নবীকরণ নিয়ে। আশু কর্তব্য হল শ্রমের উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ বিশ্ব মাত্রায় উত্তরণ। ঐতিহাসিক এই কর্তব্য সাধন সম্ভব কেবল বৈজ্ঞানিক-

টেকনিকাল অগ্রগতির স্বরণ, প্রকৌশল ও টেকনোলজির আমূল পরিবর্তন, সমস্ত টেকনিকাল, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারিকাগুলিকে সচল করার ভিত্তিতে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্বরণে ধরে নেওয়া হয় সামাজিক সম্পর্কগুলির, সর্বাপেক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সমুদ্রয়ন। বিশেষ মন দেওয়া হচ্ছে বণ্টনমূলক সম্পর্কে, সামাজিক ন্যায়ের নীতি সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গারে প্রতিষ্ঠায়। সোভিয়েত লোকেদের কাছে ন্যায়ের মৌল প্রকাশ হল শ্রমের পরিমাণ ও পরিভোগের পরিমাণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার লেনিনীয় অনুজ্ঞায়। সমাজের কাছ থেকে এমন সম্পদ কেউ চাইতে পারে না, যা সে নিজে খেটে রোজগার করে নি, এমন সম্মান ও মনোযোগ দাবি করতে পারে না, যার যোগ্য সে নয়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ স্বরণের লক্ষ্য হল শ্রমের অন্তঃসার ও চরিত্রে প্রগাঢ় পরিবর্তন ঘটানো। এ ব্যাপারে বিশেষ মন দেওয়া হচ্ছে শ্রমের সৃজনধর্মী মর্ম আর যৌথ চরিত্রের পুষ্টি, তার কৃষ্টির উন্নয়ন, সমগ্র সমাজের কল্যাণে উচ্চ ফলপ্রদ কাজে উৎসাহদানে। এ সবই আবার শ্রমকে প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনে পরিণত করায় সাহায্য করবে।

স্বরণের প্রধান সামাজিক উদ্দেশ্য হল গৃহগতভাবে নতুন স্তরে সোভিয়েত মানুষের সচ্ছলতা উন্নয়ন, বৈষয়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ পরিভোগের এমন মান ও গঠন নিশ্চিত করা যাতে সামঞ্জস্যে বিকশিত, আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তি গড়ে তোলার

লক্ষ্য সর্বাধিক পরিমাণে সাধিত হবে। কথাটা হল সমাজের স্বার্থে লোকেদের সামর্থ্য, কৃতিত্ব, গুণাবলির পরিপূর্ণ উৎসারের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা নিয়ে।

দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ দ্বরণে ধরে নেওয়া হয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানাদির গোটা ব্যবস্থার সক্রিয়তা, তাদের ক্রিয়াকর্মের উন্নয়ন। বিশেষ গুরুত্ব ধরে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারের চালনায় ক্রমেই বেশি করে নাগরিকদের টেনে আনা, জন-ক্ষমতার নির্বাচনাধীন সংস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপ উন্নত করা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং মেহনতিদের অন্যান্য গণসংগঠনের ভূমিকা বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মপরিচালনার পরিবিকাশ।

এই সমস্ত জটিল ও বিপুল কর্তব্যাদি সাধন করা যায় কেবল প্রতিটি ব্যক্তির ভূমিকা, সচেতনতা ও সংস্কৃতি বাড়িয়ে তোলার ভিত্তিতে। আগে যা বলা হয়েছে, সমাজজীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জনগণের সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপ উন্নত করার নতুন নতুন পথ অবলম্বন না করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ফলপ্রসূরূপে পরিবিকশিত হতে পারে না। ঐতিহাসিক লক্ষ্যটা যত বৃহৎ, ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তা অর্জনের জন্য অসংখ্য লোকের হিসেবী, আগ্রহী, দায়িত্বপূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয় যোগদান। সমাজতন্ত্রের শক্তি ও প্রাণবত্তার অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তার আরো সাফল্যের গ্যারান্টি হল জনগণের উদ্যোগ, উদ্যম, জীবন্ত সৃজনশীলতা, নতুন ব্যবস্থা গঠনের কর্তব্যের প্রতি তাদের সচেতন,

আগ্রহান্বিত মনোভাব। সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণীকরণের পথে যে সমৃদ্ধ মানবিক লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সমান মানবিক উপায়। সর্বাধিক পরিণত ধরনের সমাজতন্ত্র রূপায়িত হয় মানুষের ক্ষতি করে নয়, উলটে বরং তার সৃজনী সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলে, তার সামর্থ্য আর গুণাবলি বিকশিত করে।

সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব আর সুযোগ সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারে কেবল পাকাপোক্ত শান্তির পরিস্থিতিতে। সেই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্র সঙ্গতিশীলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে উত্তেজনার প্রশমনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমস্ত জাতির সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা বাড়িয়ে তোলার জন্য। এটা খুবই নিয়মসঙ্গত যে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশটাই এমন নতুন উদ্যোগ নিয়েছে যার মূলকথা হল পারমাণবিক অস্ত্র থেকে মানবজাতির মুক্তি, যুদ্ধ উদ্ভবের ভিত্তিটাই মূলোচ্ছেদ। এই লক্ষ্যগুলো থেকেই সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে নতুন ব্যবস্থার সত্যকার মানবিকতা, যা প্রকাশ পাচ্ছে যেমন তার অভ্যন্তরীণ, তেমনি তার বহির্নীতিতে, দেখতে পাচ্ছে পূরনো দুনিয়া — শোষণ, নিষ্ঠুরতা আর সামরিকতার দুনিয়া থেকে তার নীতিগত পার্থক্য।

অষ্টম অধ্যায়

জীবনযাত্রার সমাজতান্ত্রিক ধারা

বিকশিত সমাজতন্ত্রের যুগে পরিবর্তন ঘটে লোকেদের জীবনধারায় — তাদের শ্রম, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষা, বিশ্রাম, চিকিৎসাবিনোদন, শিশুদলালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। মানুষের কর্মচাপল্যে প্রকাশ পায় নতুন ব্যবস্থার সমস্ত স্ফূর্তি, সমাজজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি। মানুষ কি অনুভব করবে তার সত্তার পরিপূর্ণতা, নাকি সে সর্বদাই থাকবে বিশ্ব থেকে একটা বিবিক্তির অবস্থায়, নিজেকে অনুভব করবে সামাজিক যন্ত্রের একটা 'নাট-বল্টু' বলে — সেটা নির্ভর করে তার সক্রিয়তার চরিত্র ও মর্মার্থের ওপরে। তবে ব্যক্তির নির্দিষ্ট এক-এক ধরনের ক্রিয়াকলাপ কেবল তার জীবন পরিস্থিতিতে রূপান্তরের পরিণামই নয়, যেমন সমাজ, তেমনি

খোদ মানুষটাকেই আরো সুসম্পূর্ণ করে তোলার একটা উপায়ও বটে। সেই কারণেই লোকেদের কর্মোদ্যমের ধারার প্রশ্নটা ভাবাদর্শীয় সংগ্রামেও প্রধান স্থানে এসে যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক আর বুদ্ধজোয়া — এই বিভিন্ন ধারার জীবনযাত্রার প্রতিফলিত হয় দু'টি জগৎ, দু'টি বিপরীত সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সবকিছুই মানুষের জন্য

জীবনযাত্রার কোন নতুন ধরন সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছে সমাজতন্ত্রে? দুই জগতের তুলনায় এইটেই প্রধান প্রশ্ন।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা নির্ধারিত হয় সর্বাত্মক তৎসংশ্লিষ্ট উৎপাদনের প্রণালী দিয়ে। লোকেদের ক্রিয়াকর্মের একটা ধারা থেকে অন্য ধারায় উৎক্রমণ সম্ভব কেবল উৎপাদনের পূরনো প্রণালী পুনর্গঠনের ফলে। তবে জীবনধারাকে কেবল ব্যক্তির অস্তিত্বের বৈষয়িক পরিস্থিতিতে, তার অস্তিত্ব ও আচরণের কেবল কোনো না কোনো করণিকায় পর্যাবসিত করা উচিত নয়। সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল মানুষের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক পারিসর।

সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার মধ্যে পড়ে শ্রম, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের পাঠ, শিল্পচর্চা, শিল্পকলা উপভোগ, লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা, শরীরচর্চা ও ক্রীড়া ইত্যাদি।

সমাজতন্ত্রে গণপারিসরে বদলিয়ে যেতে থাকে শ্রমের মর্মার্থ, ক্রমেই তা হয়ে ওঠে সৃজনধর্মী, শ্রমরতদের গুণ-দক্ষতার মান উঁচু হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নে গুরুত্বের কার্যিক শ্রম, অদক্ষ শ্রম হ্রাস এবং পরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা হল সর্বাপ্তে জীবনযাত্রায় শ্রমের ধরন, যখন 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে' নীতি কার্যকৃত হয়।

কাজের ঘণ্টা হ্রাস আর অবসর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মেহনতিদের অবকাশযাপন হয়ে উঠছে ক্রমেই সারগর্ভ আর বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু প্রধান কথা হল শ্রম আর অবকাশ, কাজ আর পাঠ, সৃজন আর চিন্তাবিনোদন পরস্পরকে পুষ্ট করে চলেছে। মানুষের সর্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপে তার প্রবণতা, সামর্থ্য, দৈহিক ও মানসিক শক্তির অবাধ বিকাশ ও সার্থকতা লাভে সাহায্য হয়। মানুষের বহুদুর্খী বিকাশের সমস্ত সুযোগ করে দেয় সমাজতন্ত্র।

তবে লোকে কখনো একা একা কাজ করে না। সর্বদাই সে নির্দিষ্ট একটা যৌথের সদস্য, শ্রেণী আর জাতির একজন লোক। সমাজতান্ত্রিক জীবনধারায় নির্ধারিত হয় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে লোকেদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের প্রকৃতিই এমন যে তাতে সমাজ ও যৌথের লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত লক্ষ্য মিলে যায়। মানুষের বৈষয়িক সচ্ছলতা ও সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধি,

তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে মেহনতিদের একত্র প্রয়াসে সামাজিক সম্পদ বর্ধনের ভিত্তিতে। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শুরু হয় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক রূপান্তরের প্রক্রিয়া। ক্রমেই বেশি করে ব্যক্তিস্বাভাবের স্থান নিতে থাকে যৌথ মনোবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় আসে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, সংযোগিতা আর পারস্পরিক সাহায্য, লোকেদের প্রসঙ্গে অবিশ্বাস, ভয়, শত্রুতা সরে গিয়ে দেখা দেয় মানবিকতা, শ্রুভেচ্ছা ইত্যাদি।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্য হল যৌথ মনোবৃত্তি, সখ্য, পারস্পরিক সাহায্য, সমৃদ্ধ নৈতিকতা, সমস্ত জাতির লোকেদের মধ্যে মৈত্রীর পরিবেশ। আত্মমর্যাদা নিয়ে সোভিয়েত লোকেরা গর্ব বোধ করে, সেইসঙ্গে অন্যান্য জাতির প্রতিও তারা সশ্রদ্ধ। নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক মন্দির জন্য সংগ্রামরত সমস্ত নিপীড়িত জনগণকে সাহায্যের জন্য তারা সচেষ্ট।

চিন্তাধারা ও জীবনধারা

মানুষের জন্য সবচেয়ে অন্তর্কূল পরিস্থিতি ও সদুযোগ থাকলেও সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ব্যক্তির প্রকৃতি, তার বিশ্ববীক্ষা, তার মূল্যবোধ আর প্রত্যয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যাপক মেহনতি জনগণের মধ্যে গড়ে দেয় বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা। তার বনিয়াদ হল

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব। মাঝে মাঝে লোকে জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে বিশ্ব সম্পর্কে বৈঠক ধারণার দরুন সঠিক দিশারি কিছুতেই আর খুঁজে পায় না। এতে 'নিজের পূর্ণ দৈর্ঘ্যে উঠে দাঁড়াতে' বাধা হয়, তার ক্রিয়াকলাপ আড়ষ্ট হয়ে থাকে, নয় চালিত হয় ভুল পথে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের কম্পাস তেমন জীবনের পথনির্দেশ করে যা বৃহৎ সামাজিক সারার্থে পরিপূর্ণ, ব্যক্তির পক্ষে যা তৃপ্তিকর। মানুষের বিশ্ববীক্ষা আর তার ক্রিয়াকলাপের চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কটা সরাসরি বিদ্যমান। উজ্জ্বল চিন্তাকর্ষক জীবন যার কাম্য, তার উচিত বৈপ্লবিক তত্ত্ব অধ্যয়ন করা, সমস্ত মেহনতির মূর্তির জন্য, শান্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামে যোগ দেওয়া।

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব অনুশীলনে বাস্তবের ব্যবহারিক পুনর্গঠনের, নতুন দুনিয়া গঠন ও প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি বোঝায় সাহায্য হয়। তবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষা যে কেবল তাত্ত্বিক চর্চা ও চিন্তাভাবনা থেকেই এসে যায় তা নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ব্যক্তির সক্রিয় যোগদান ছাড়া কমিউনিস্ট বিশ্ববীক্ষা গড়ে উঠতে পারে না, নতুন ব্যবস্থার জন্য ব্যবহারিক সংগ্রাম প্রতিটি মানুষের ভাবাদর্শীয়-তাত্ত্বিক বিকাশে সহায়তা করে।

পূরনো দুনিয়ার প্রতিরোধ সত্ত্বেও নতুন ব্যবস্থা সঙ্গতি সহকারে এবং অবিচলে বিকশিত হচ্ছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার একসারি দেশে। সমাজতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হল নতুন মানুষ। গ্রহের

এক-বষ্ঠাংশে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সমাজতন্ত্র লোকেদের
সন্দেহাতীতরূপে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভবিষ্যৎ তার পক্ষে,
সমাজতন্ত্র হল শান্তিপূর্ণ, সুখী, সৃজনী সুযোগ
আর সন্মানে ভরপুর জীবন। কিন্তু তার জন্য লড়তে
হবে। পুরনো শোষক দুনিয়ার শক্তি স্বেচ্ছায় চলে যায়
না ইতিহাসের মণ্ড থেকে। নিজেদের সম্মিলিত
আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ মারফত তাদের উৎখাত করতে
হবে জনগণকেই।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা

নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

জনগণের সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ একটা দীর্ঘকালীন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, তার ভেতর দিয়ে এক-একটা দেশ ও দেশগোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শর্ত পেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে খসে গিয়ে সমাজতন্ত্রের পথ নেয়। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সূত্রপাত হয় ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে বিপ্লব জয়লাভ করার ফলে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র। গড়ে উঠল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা, যা বিশ্বে শক্তির অনুপাত আমূল বদলে দিয়েছে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে। এশিয়া ও লাতিন আমেরিকায় পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিতে সমর্থিত

হল ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত একসারি নবীন
জাতীয় রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের প্রবণতা।

এ শতকের ৮০'র দশকের গোড়া নাগাদ মানবজাতির
এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক চিরকালের জন্য শোষণ
ও পীড়ন ঘুচিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পথে এসে
গেছে। সমাজতন্ত্রের পথ নিচ্ছে ক্রমেই নতুন নতুন
জাতি। বিকশিত, সুসম্পূর্ণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব
ব্যবস্থা, উদ্ঘাটিত করছে নতুন সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব।

বিশ্ব সমাজতন্ত্র তার মূর্ত-নির্দিষ্ট কৃতিত্ব দিয়ে
দেখিয়ে দিচ্ছে পুঞ্জিতন্ত্রের চেয়ে তার প্রাধান্য। সামাজিক
উৎপাদনের বিকাশ সমাজতন্ত্রে চলেছে যে গতিবেগে,
পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা অলভ্য। যেমন, ১৯৫০ থেকে
১৯৮২ সালের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা
পরিষদের অন্তর্গত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জাতীয়
আর বেড়েছে ৮-৩, মোট শিল্পোৎপাদন ১৩,
বহির্বাণিজ্য ৩০ গুণ। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি
সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলির ভাগে ছিল
বিশ্বের জাতীয় আয়ের ২৫, শিল্পোৎপাদনের ৩৩
শতাংশ। অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও টেকনিকের ক্ষেত্রে
অর্জিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। অধিবাসীদের
পরিপূর্ণ কর্মসংস্থান, প্রত্যেকের বিশেষ বৃত্তি ও দক্ষতা
অনুসারে কাজ, বিনা পয়সায় শিক্ষা আর চিকিৎসা,
মাতৃ- ও শিশুমঙ্গল, পেনশন, ইত্যাদি অনেককিছু
সামাজিক সুযোগসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজতান্ত্রিক
দেশগুলির জনজীবনের একটা একান্ত স্বাভাবিক অঙ্গ।
জনক্ষমতা নিশ্চিত করছে সমাজের রাজনৈতিক ঐক্য,

কার্যকরী করছে জাতির সমতা ও মৈত্রী, অনুসরণ করছে শান্তিকামী বহিনীতি, সাম্রাজ্যবাদ আর ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম সমর্থন করছে।

নতুন সমাজ নির্মাণে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের বড়ো একটা কারণ হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা অবজেকটিভ ভিত্তিপ্ৰসূত — সেটা হল সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর রাষ্ট্রশ্রমতার সাধারণ শ্রেণীগত সারার্থ, সাধারণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববীক্ষা। সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা হল সমাজতন্ত্রের পথাবলম্বী, স্বার্থ ও লক্ষ্যের মিলে, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক একাত্মতার নিবিড় বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন সার্বভৌম জাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মেল। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা হল দেশেদের মধ্যে নতুন ধরনের একটা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক।

সামাজিক একটা ব্যবস্থা হিশেবে সমাজতন্ত্রের যা মর্মার্থ, তা থেকেই আসে নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে’ মার্কস ও এঙ্গেলস বর্জোয়া জাতি ও রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের তুলনায় সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে জাতিগুলির মধ্যে নীতিগতভাবে পৃথক সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। তাঁরা লেখেন: ‘যে পরিমাণে বিলুপ্ত হবে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে শোষণ, সেই পরিমাণে এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে শোষণও বিলুপ্ত হবে।

জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণীগত বৈরিতা পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগুলির নিজেদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্কেরও পতন হবে।*

নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বকে পরে বিকশিত করেছেন লেনিন। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, ‘পৃথি়ি একটা আন্তর্জাতিক শক্তি। তাকে পরাস্ত করতে হলে দরকার শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন, তাদের আন্তর্জাতিক দ্রাঘত্ব।

আমরা জাতীয় শত্রুতার, জাতীয় বিভেদের, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যসর্বস্বতার বিরোধী। আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী, ইণ্টারন্যাশনালিস্ট।** রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় লাভের একবছর পরে ১৯১৮ সালের ১৩ নভেম্বর সোভিয়েত সরকারের বহির্নীতি সংক্রান্ত লেনিন স্বাক্ষরিত দলিলে পীড়ন থেকে মুক্ত জাতিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা হয়: ‘সেটা হবে সামরিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থনৈতিক দাসত্বের ধূলিসাৎ ব্যবস্থাটার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃজন ও সংহতির জন্য সংগ্রামে সমস্ত জাতির মেহনতি জনগণের ইউনিয়ন।***

* Marx K., Engels F. *Collected Works*, Vol. 6, p. 503.

** Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 30, p. 293.

*** ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের বহির্নীতির দলিলপত্র’, খণ্ড ১, মস্কা ১৯৫৭, পৃঃ ৫। (রুশ ভাষায়)।

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ভাবনা ইতিহাসে প্রথম বাস্তব রূপ নেয় সোভিয়েত ইউনিয়নে, যেখানে গড়া হয়েছে সমাধিকারী জাতিদের নিয়ে বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং যেখানে আছে শ্রেণীগত ও জাতীয় বৈরিতা বর্জিত জাতিগত সম্পর্ক। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে নতুন সম্পর্কগুলির চরিত্র, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রগুলির মিলনও ঘটেছে সেই সম্পর্কগুলির ভিত্তিতে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নীতির ওপর। আন্তর্জাতিক একাত্মতা বিকাশের এটা সেই ধাপ যখন মেহনতিরা ক্ষমতায় এসেছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির পরিণত হয়েছে শাসক পার্টিতে, যখন তারা কার্যক্ষেত্রে নতুন সমাজ নির্মাণ করছে, সমাজতান্ত্রিক ধরনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সংহত করছে, সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিকে রক্ষা করছে সম্মিলিত প্রয়াসে।

নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার যে নীতি তার মধ্যে সর্বাপ্রাণে পড়ে জাতিসমূহের আত্মনির্ধারণের অধিকার, ভূভাগের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা মান্য করা, রাষ্ট্রগুলির সমাধিকার, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বর্জন। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইসব প্রগতিশীল নীতি কার্যকরী করার জন্য জনগণ সংগ্রাম করে এসেছে সেই মধ্যযুগ থেকেই।

নিজেদের উদয়কালে বর্জ্যোয়া শ্রেণী এ নীতিগুলি ঘোষণা করলেও তা কার্যে পরিণত করার কোনো চেষ্টা করে নি। সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব কার্যক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের গণতান্ত্রিক নীতিগুলির স্থূল লঙ্ঘনই সূচিত করে। ইতিহাসে প্রথম এ নীতিগুলি বাস্তবে অনুসৃত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কে।

মানুষ কর্তৃক মানুষকে, জাতি কর্তৃক জাতিকে শোষণ থেকে মুক্ত সমাজ হিসেবে সমাজতন্ত্রের যে প্রকৃতি, তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত, নতুন ধরনের সম্পর্কের আরেকটি মূলনীতি: নতুন সমাজ নির্মাণে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রামে, সমাজতন্ত্রের সুরক্ষিত রক্ষায় ভ্রাতৃকল্প পারস্পরিক সাহায্য।

সমাধিকারে সহযোগিতা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্যসূচক নিবিড় ভ্রাতৃকল্প সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের ফলে গড়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির সমস্ত দেশগুলিতেই নতুন সমাজ নির্মাণের পক্ষে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। অন্যদিকে আবার আলাদা আলাদা প্রতিটি দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হল সমগ্র সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অগ্রগতির নির্ধারক শর্ত। সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ, সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন, প্রতিটি

ভ্রাতৃদেশের প্রগতি সমাজতন্ত্রের সাধারণ কর্মযজ্ঞের স্বার্থ মেটায়, সুদৃঢ় করে তাদের ঐক্য। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিভুক্ত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি'রা মনে করে যে ভ্রাতৃকল্প রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় তাদের পক্ষে অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা পরাক্রম সুদৃঢ় করা, জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধির স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগকে আরো পূর্ণাকারে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

প্রথম স্থানে পড়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক সহযোগিতার ভূমিকা। নতুন সমাজ নির্মাণের তাত্ত্বিক নীতিগুলির অভিন্নতা, সামাজিক বিকাশের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্যাগুলির একই মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিভুক্ত দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারেরা ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে কিছুকাল অন্তর অন্তর আলাপ আলোচনা ও সম্মেলনে বসে। বিশেষ গুরুত্ব ধরে ভ্রাতৃস্থানীয় পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের সেই বৈঠকগুলি যাতে সমাজতন্ত্র নির্মাণ, সহযোগিতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একত্র গ্রন্থাকর্মের নীতিগত প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়। তাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বোঝাপড়ায় এসে সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করা হয় রাজনীতি আর অর্থনীতি, ভাবাদর্শ আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। ভ্রাতৃস্থানীয় দেশগুলির পার্টি সংগঠনগুলি সহযোগিতার বহু সূত্রে জড়িত যেমন প্রদেশ ও নগর, তেমনি জেলা ও বড়ো বড়ো উদ্যোগাদির আয়তনেও। তাদের মধ্যে চলে পার্টিগত-রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শীয়

কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়, গৃহীত হয় সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি। রাষ্ট্রিক সংস্থা, সামাজিক সংগঠন, অর্থনৈতিক উদ্যোগ ও উৎপাদনী যৌথগুণিলর মধ্যে সহযোগিতার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে নানামুখী। একত্রে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্তব্য সম্পাদনে সরাসরি যোগ দিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুণিলর লক্ষ লক্ষ নাগরিক। তাতে করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুণিলর অভ্যন্তরীণ ও বহির্নীতি রূপারণে আন্তর্জাতিক মেল গড়ে ওঠায় সাহায্য হয়, পরিণামে কাছাকাছি এসে যায় তারা।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের দেশগুণিলর উৎপাদনী শক্তি অত্যন্ত উচ্চ মাত্রায় উঠেছে, জাতীয় অর্থনীতির বহুশাখার শিল্প কাঠামো গড়ে উঠেছে সেখানে। অর্থনৈতিক বিকাশের রণনীতি হিশেবে কমিউনিস্ট পার্টিগুণিল গ্রহণ করেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের সূকৃতিগুণিলর অঙ্গাঙ্গি মিলনের কর্তব্য। তাই পরিষদভুক্ত দেশগুণিলর মধ্যে চলেছে অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল সহযোগিতার অবিরাম গভীরতাবর্ধন ও সম্পূর্ণকরণ। বৈষয়িক উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভ্রাতৃস্থানীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুণিলর পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের ফলে ঘটছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন যা সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুণিলকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে।

মার্কস ও এঙ্গেলস যা বলেছেন, উৎপাদনের

আন্তর্জাতীয়করণ হল সমগ্র সমাজজীবনের আন্তর্জাতীয়করণ প্রবণতার ভিত্তি। লেনিনের এই উক্তিতেও তা সমর্থিত হয়: ‘...মানবজাতির সমগ্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আর্থিক জীবনের ক্রমেই আন্তর্জাতীয়করণ হতে থাকে পুঞ্জিতশ্রেণী। সমাজতন্ত্র তার পুরোপুরি আন্তর্জাতীয়করণ ঘটাবে।’* তিনিই লক্ষ করেছিলেন, ‘সমস্ত জাতির প্রলেতারিয়েত কর্তৃক নিয়ম্য সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে একক, অখণ্ড হিশেবে বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে ওঠার প্রবণতা, যে প্রবণতা পুঞ্জিতশ্রেণী বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে এবং সমাজতন্ত্রে যা নিঃসন্দেহেই আরো বিকশিত ও পুরোপুরি সম্পূর্ণ হবে।’**

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে ১৯৭১ সালের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভূতির যৌগিক কর্মসূচিতে, যাতে পরিষদভুক্ত দেশগুলির মধ্যে নতুন রূপের সহযোগিতা, অর্থাৎ নতুন রূপের উৎপাদনী সম্পর্ক বিকাশের কথা আছে, তার কাজ হবে সেগুলিকে উৎপাদনী শক্তির বর্তমান বিকাশের উপযোগী করা। ১৯৮৪ সালে সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনে বৈষয়িক উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ সহযোগিতার পথ নির্ণীত হয়। তাতে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির একটা যৌগ কর্মসূচি রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে,

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 19, 1977, p. 246.

** Ibid., Vol. 31, p. 147.

তাতে থাকবে উৎপাদনের অগ্রগামী শাখাগুলোয় টেকনিকাল সমবায় নিয়ে একসারি চুক্তি।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন হল আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমবিভাগ, জাতীয় অর্থনীতিগুলির নৈকট্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক যোগ গড়ে ওঠার প্রণালীবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। পরিষদভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রা হ্রাস সমান হয়ে আসছে, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও টেকনিকের বনিয়াদি শাখাগুলিতে যোগাযোগ হয়ে উঠছে গভীর ও সুস্থির, বিস্তীর্ণ হচ্ছে এসব দেশের আন্তর্জাতিক বাজার, সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে পণ্য-মুদ্রা সম্পর্ক।

প্রতিটি দেশের বিকাশের পাঁচসাল্য পরিকল্পনাগুলির সমন্বয়, বৈষয়িক উৎপাদনের প্রধান শাখাগুলিতে সহযোগিতার একত্রে রচিত দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির ভিত্তিতে সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলি শিল্প ও কৃষিতে, বৈজ্ঞানিক-গবেষণা আর পরীক্ষামূলক প্রকল্প রচনার ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ ও সমবায়ের পথ নিয়েছে। প্রতিটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আর উৎপাদনী সম্ভাবনার কথা মনে রেখে যুক্তিযুক্ত আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে অর্থনৈতিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক ধারায় শক্তি কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়, তার ফলে বৈষয়িক সম্পদ ও শ্রম ব্যয় অনেক বেঁচে যায়। এইসব দেশে যে বিশেষীকৃত উৎপাদন গড়ার কথা অথবা ইতিমধ্যেই বিকশিত হচ্ছে, তা সজ্জিত হচ্ছে অগ্রণী টেকনিকে এবং অঙ্গীভবনের শরিক সমস্ত দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই পরিমাণ উৎপাদন

করছে। বিশেষ মন দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত শাখার বিকাশে যা বর্তমান বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতিতে নির্ধারক ভূমিকা নিচ্ছে: পারমাণবিক শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক শিল্প, কম্পিউটার, বস্ত্রনির্মাণে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন, রোবট এবং শিল্পের জীববিদ্যাঘটিত, রাসায়নিক ইত্যাদি নানা শাখা।

এইসব দেশের মধ্যে সহযোগিতার বর্ধন ও সুসম্পূর্ণীকরণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক অঙ্গীভবন চলছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থকে মান্য করে শরিকদের পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাধীনে, অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা, জাতীয় সংগঠনগুলির আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রশ্ন এর আওতায় পড়ে না। সেইসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ একটা রুদ্ধদ্বার অর্থনৈতিক জোট নয়। তার সঙ্গে সহযোগিতা করে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা বেশ কিছু উন্নয়নশীল ও পুঁজিতান্ত্রিক দেশও।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিকশিত হয়েছে সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিভুক্ত জাতিগুলির সাংস্কৃতিক প্রস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জাতীয় সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক সমৃদ্ধি আর নৈকট্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক আন্তর্জাতিক দিকগুলির রূপলাভ। তাতে সাহায্য করছে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ভাষা থেকে ললিত ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অনুবাদ, চারুকলা

প্রদর্শনীর বিনিময় চলছে, আয়োজিত হচ্ছে নাট্যদল প্রভৃতির ট্যুর-শো, চলচ্চিত্র উৎসব। সাধারণ ও বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা একটা উঁচু মানে পৌঁছেছে। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলির বিজ্ঞানী আর বৈজ্ঞানিক যৌথগুণি তাদের প্রয়াস ঐক্যবদ্ধ করেছে সামাজিক, প্রাকৃতিক ও টেকনিকাল বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি নিয়ে কাজকর্মে। সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক যোগাযোগের প্রসারে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিভুক্ত দেশগুলির সর্বাঙ্গীণ নৈকট্যসাধনে সাহায্য হয়।

শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা বাড়িয়ে চললেও বিশ্বে যে সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠছে, তার হিসেব নিতেও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাধ্য। সাম্রাজ্যবাদের সম্ভবপর আগ্রাসনী ক্রিয়াকর্ম থেকে নিজেদের জনগণের অর্জন রক্ষার জন্য তারা যৌথ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। সম্মিলিতভাবে আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে একটি প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রীতে, ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনে, তার আওতায় তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের নীতি স্থির করে, নিজেদের সশস্ত্র শক্তি সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা নেয়।

মৈত্রী, সহযোগিতা আর পারস্পরিক সাহায্যের যে ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫৫ সালে, সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালে গঠিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসনী ব্লক ন্যাটোর ক্রিয়া-কলাপ প্রসঙ্গে প্রত্যুত্তরমূলক একটা ব্যবস্থা। ওয়ারশ

চুক্তির প্রধান কথা হল তার সারিক দেশগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং ইউরোপে শান্তি রক্ষা করা। ওয়ারশ চুক্তির সারিক দেশেরা (বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, গণতান্ত্রিক জার্মানি, পোল্যান্ড, রুমিনিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চেকোস্লোভাকিয়া) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে শক্তির হুমকি অথবা প্রয়োগ থেকে তারা বিরত থাকবে এবং তাদের কারো ওপর সশস্ত্র আক্রমণ ঘটলেই কেবল সামরিক সমেত তাদের আয়ত্তাধীন সমস্ত উপায়ে আক্রান্তকে সাহায্য করবে। চরিত্র এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়ে ওয়ারশ চুক্তি সংগঠন উত্তর-আটলান্টিক ব্লক বা ন্যাটো থেকে আমূল পৃথক। ন্যাটোর যে রাজনৈতিক পলিসি আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বর্ধন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ, রকেট-পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে চালিত, তার বিপরীতে ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতা, অস্ত্র সংযমন ও নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈবাণবিক অস্ত্রের ওপর প্রশ্নহীন নিষেধ, ইউরোপে এবং সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষপাতী। ওয়ারশ চুক্তি সংগঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা — রাজনৈতিক পরামর্শ কমিটির যে অধিবেশন হয় প্রাগে ১৯৮৩ সালে, তাতে গৃহীত হয় রাজনৈতিক বিবৃতি। বিবৃতিতে বিশ্বের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে সুস্থ করে তোলা, পারমাণবিক প্রলয়ের দিকে আর গড়িয়ে যেতে না দেওয়ার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রয়াস সমর্থিত হয়। বিশেষ করে ওয়ারশ চুক্তি আর

ন্যাটোর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করা ও শান্তি রক্ষার জন্য চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয় তাতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরালস্য, ধারাবাহিক ও শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতির কল্যাণে সাক্ষরিত হয়েছে দুই শ্রেণীর তথা মাঝারি ও তার কম পাল্লার রকেট বিলুপ্তির সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তি।

ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতায় এমন অবস্থা নিশ্চিত হয় যাতে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির শক্তি হয়ে দাঁড়ায় প্রতিটি দেশের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। তাদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের মূলে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক-অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, অন্যান্য দেশগুলির সৈন্যবাহিনীর জন্য অশ্রুশস্ত্র সরবরাহে, তাদের সামরিক অফিসার প্রস্তুতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য। ষোঁথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে সম্ভব হয় নিজস্ব সামরিক ব্যয় হ্রাস করে বেশ কিছু বৈষয়িক সম্পদ ও লোকবল জাতীয় অর্থনীতির শান্তিপূর্ণ শাখাগুলির বিকাশে নিয়োগ করা। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধিতে আগ্রহী নয় সমাজতান্ত্রিক দেশেরা, সেটাকে তারা সীমিত রাখে তাদের প্রতিরক্ষাসামর্থ্য নিশ্চিত করার মতো পরিধির মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার সফল বিকাশ হল তাদের মূলগত স্বার্থের সমাপন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থকে নিবিড়ভাবে মেলাবার সামর্থ্যের সন্দেহাতীত সাক্ষ্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকের মধ্যে যোগাযোগ

সহমিতালির সমগ্র স্বার্থের সঙ্গে প্রতিটি দেশের জাতীয় স্বার্থের সর্বাধিক মিলন হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটা নীতি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকের মধ্যে যোগাযোগটা কেমন?

‘জাতীয়’ আর ‘আন্তর্জাতিককে’ পরস্পরের বিপরীতে রাখা ঠিক নয়, কেননা সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে মূলগত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ মিলে যায়। ‘আন্তর্জাতিক’ কথাটায় বোঝায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের সাধারণ স্বার্থ, প্রযুক্তি, লক্ষ্য। কিন্তু ‘আন্তর্জাতিককে’ শুধু জাতীয় স্বার্থগুলির সমষ্টি বলে ধরা ঠিক নয়: বিশ্ব সমাজতন্ত্রের যে সংগ্রাম, তার সাধারণ লক্ষ্য ও ধারা তার আলাদা আলাদা জাতীয় বাহিনীগুলির চলতি কর্তব্য ও প্রযত্নের সঙ্গে সর্বদাই মিলে যাবে এমন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিজেদের জাতীয় প্রয়োজনের কথা ভেবে কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি আফগানিস্তান, কাম্পুচিয়া, আঙ্গোলা অথবা নিকারাগুয়ার মেহনতিদের সমর্থন করতে আগ্রহ বোধ নাও করে, তাহলেও বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিকাশের সঙ্গে জড়িত তাদের সাধারণ আন্তর্জাতিক স্বার্থ দাবি করে এরূপ আন্তর্জাতিক সমর্থন। অন্যদিকে আবার প্রতিটি দেশের কতকগুলি জাতীয় স্বার্থ সর্বদা এবং সর্বকিছুতেই অন্যান্য কিছু দেশ এবং সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থের সঙ্গে মিলবেই এমন নয়।

প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিশিষ্ট জাতীয় স্বার্থ দেখা দেয় সর্বাগ্রে ঐতিহাসিক কারণে। এক-একটা দেশ ও জাতির সমাজতন্ত্রে উত্তরণ শূন্য হয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিভিন্ন মান থেকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ে প্রতিটি জনগোষ্ঠী এমন কিছু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে যা কেবল তারই বৈশিষ্ট্যসূচক। প্রতিটি দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে পরিবর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে। এর ফলে প্রতিটি দেশ পালন করে সমাজতন্ত্র নির্মাণের যেমন সাধারণ (আন্তর্জাতিক) তেমনি বিশিষ্ট (জাতীয়) কর্তব্য। নতুন সমাজ নির্মাণের যে কর্তব্য সমস্ত দেশের পক্ষেই সাধারণ, তা সম্পাদিত হয় নির্দিষ্ট দেশটির বৈশিষ্ট্যসূচক রূপের মধ্যে দিয়ে। লেনিন বলেছেন, ‘সমস্ত দেশই সমাজতন্ত্রে উপনীত হবে, এটা অনিবার্য, কিন্তু সবাই ঠিক একইভাবে আসবে না, প্রত্যেকেই গণতন্ত্রের কোনো না কোনো রূপে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কোনো না কোনো প্রকারভেদে, সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কোনো না কোনো গতিবেগে এনে দেবে তার স্বকীয়তা।’*

সমাজতন্ত্র নির্মাণের পরিস্থিতি, পথ, রূপ, পদ্ধতি, গতিবেগের পার্থক্য দিয়ে বহুদিক থেকে স্থির হয়ে যায় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক, দেখা দেয় কতকগুলো স্বার্থে অমিল.

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 23, p. 70.

পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্নে নিজস্ব একটা অবস্থান।
 এইসব মূর্খকিল কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে
 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের মান
 সমান হয়ে আসার প্রক্রিয়া। পৃথিবীতে যেখানে
 সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ও একচেটিয়াগুলি স্বল্পবিকাশিত ও
 পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে পীড়ন করে, তার বিপরীতে
 সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা কেবল তদন্তগত সমস্ত রাষ্ট্রের
 রাজনৈতিক সমাধিকার অনুসরণ করে তাই নয়, সমস্ত
 সমাজতান্ত্রিক দেশের বাস্তব সমতা প্রতিষ্ঠিত করতেও
 চেষ্টা করে। এইরূপ আন্তর্জাতিকতাবাদী রাজনীতির
 ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মাথাপিছু উৎপাদনের
 মানের মধ্যে ব্যবধান অনবরত কমে আসে। সমাজতান্ত্রিক
 দেশগুলির ক্রমশ কাছিয়ে আসার প্রক্রিয়া বর্তমানে
 আত্মপ্রকাশ করছে একটা নিয়মবদ্ধতা হিশেবে।
 সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক বিকাশের মান হবে
 যত উঁচু এবং পরস্পরের কাছাকাছি, তাদের মধ্যে
 পারস্পরিক বোঝাবুঝিও হবে ততই বেশি, ততই
 আঙ্গিক ও গভীর হবে তাদের মধ্যে সহযোগিতা।
 অনেক কিছুই অবশ্য নির্ভর করে শাসক
 মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির পলিসির ওপর,
 ঐক্য রক্ষা, আত্মবদ্ধতা আর জাতীয় স্বাভাবিকতাবাদের
 বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে, আন্তর্জাতিক কর্তব্যের
 বিবেচনা ও তা সম্পাদন করতে পারার সামর্থ্যের ওপর।
 আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিলে সেটা
 মিটিয়ে ফেলা যায় এবং মোটানো হচ্ছে মার্কসবাদ-
 লেনিনবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার অবস্থান

থেকে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে।

জাতিবাদ উশাকিয়ে তোলা, সমাজতান্ত্রিক সহমিতালিতে ভাঙন ঘটাবার জন্য যেকোনো সুযোগ কাজে লাগায় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিগ্রিয়া। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টবিরোধীরা 'নড়বড়ে করে দেওয়ার' পলিসি অনুসরণের ভয়ানক পক্ষপাতী, কোনো কোনো দেশের সঙ্গে তারা সম্পর্ক পাতার চেষ্টা করে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির গাণ্ডিতে বাধ্যবাধকতা থেকে দেশটির 'মুক্তি'র শর্তে। সমাজতন্ত্রের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন শত্রুরা জাতিবাদ উশাকিয়ে তুলতে চায় যে সাধারণ ভিত্তিটার ওপর, সেটা হল সোভিয়েতবিরোধিতা। জাতিবাদকে সোভিয়েতবিরোধিতার খাতে চালাবার জন্য তাদের এই প্রচেষ্টাটা দুর্বোধ্য কিছু নয়: সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই যে রয়েছে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের প্রধান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক খুঁটি। আর সমাজতন্ত্রের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বের আঘাত হানার জন্য সাম্রাজ্যবাদ সর্বদাই জাতিবাদকে চালাতে চায় সোভিয়েতবিরোধী খাতে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস অদ্রান্তরূপে দেখিয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নীতিসম্মত পলিসিকে হতে হবে জাতিবাদ আর সোভিয়েতবিরোধিতা উভয়ের প্রতিই আপোসহীন। এ নীতির যেকোনো বিচ্যুতিতেই সমাজতান্ত্রিক সহমিতালি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া দেশটির বৈপ্লবিক স্ফূর্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে

সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নীতিতে বিশ্বস্ত থাকলে
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাধারণ ও জাতীয় স্বার্থকে
সঠিকভাবে মেলানো সম্ভব। নতুন, সর্বাধিক প্রগতিশীল
সমাজব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করে সমাজতান্ত্রিক
দেশগুলি দ্রুতবর্ধমান প্রভাব ফেলছে বর্তমান দুনিয়ার
বিকাশের ওপর।

দশম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদের পীঠভূমিতে শ্রেণী সংগ্রাম

আজকের পুঁজিতন্ত্র

বিশ্বে সমাজতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি, ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনের জোয়ার — এইসব ও অন্যান্য ঘটনার প্রভাব পড়ছে সমাজতন্ত্রের পথ খুলে দেয় যে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, তার জন্য প্রধান প্রধান পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মেহনতিদের সংগ্রামের ওপর। তবে শুধু এগুলিরই নয়। বর্তমান পর্যায়ে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের বৈশিষ্ট্যও নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা নিচ্ছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব, এ শতকের ৫০-এর দশকে শুরু হয়ে যা টেকনিক ও উৎপাদনের সঙ্গে বিজ্ঞানকে মেলানোর ভিত্তিতে উৎপাদনী শক্তির রূপান্তর

ঘটাচ্ছে। অভূতপূর্ব বেগে এগিয়ে চলেছে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতি: ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের স্বয়ংক্রিয়তা, পারমাণবিক সমেত নতুন নতুন শক্তির ব্যবহার, কৃষির শিল্পায়ন, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক পরিগণক টেকনিকের প্রবর্তন, রকেট-পারমাণবিক অস্ত্র সৃষ্টি, মহাকাশ আয়ত্তির সূত্রপাত।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে সমাজজীবনের সমস্ত দিকে। দেখা দিয়েছে নতুন নতুন বৃত্তি ও বিশেষজ্ঞতা, ছড়াচ্ছে তা ব্যাপকভাবে। শিক্ষা, নৈপুণ্য, সংস্কৃতির মান বৃদ্ধির প্রয়োজন হচ্ছে। বেশ পরিবর্তন ঘটেছে জীবনযাত্রার পরিস্থিতি কিরকম হওয়া উচিত তার দাবিতে, সেইসঙ্গে বাড়ছে অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য অংশের জীবনযাত্রার মান।

কিন্তু পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল অগ্রগতির সুফল সর্বাপ্রাণে কাজে লাগছে একচেটিয়া আর সমরশিল্প কমপ্লেক্সের স্বার্থে। পৃথিবীতান্ত্রিক উৎপাদনী সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তি ও বিজ্ঞানের অবাধ বিকাশ যে খাপ খাচ্ছে না তা উদ্ঘাটিত হচ্ছে একেবারে প্রকট হয়ে, তার পরিণামে অর্থনৈতিক বিরোধ আর সামাজিক সংঘাতগুলির তীব্রতা অনেক বেড়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আর বহির্নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াগুলির প্রভাবও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষমতাবহ বুর্জোয়া সামাজিক মহড়া আর চালবাজির আশ্রয় নিচ্ছে, কিছুর কিছুর ছাড় দিচ্ছে মেহনতিদের, শ্রেণীগত আর রাজনৈতিক আপোস রফার চেষ্টা করছে। তবে

তাদের পক্ষে তেমন সম্ভাবনা এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তাই সবদিকেই প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিক্রিয়া। দমন যন্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার আর কমিউনিজমবিরোধিতা — শাসকদের সরকারি পলিসি। ‘কমিউনিজমের বিপদ রোধের’ অছিলায় সাম্রাজ্যবাদ অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শের সামরীকরণ চালাচ্ছে, সশস্ত্র শক্তি বাড়িয়ে তুলছে, প্রসারিত করছে সমরশিল্প কমপ্লেক্সের ক্রিয়াকলাপ।

ভাবাদর্শের দিক দিয়ে অধিবাসীদের সাঁতলে তোলার জন্য গড়া হয়েছে ব্যাপক সংবাদ মাধ্যমের একটা বিস্তৃত ব্যবস্থা। টিভি, রেডিও, সংবাদপত্রের বহুল প্রচলনে সম্ভব হয়েছে জনসাধারণকে নিজেদের মনের মতো সংবাদ সরবরাহ।

পৃথিবীর দেশগুলিতে মেহনতিদের ভাবাদর্শীয় মোচড় দেওয়া হচ্ছে প্রধানত কোন দিকে?

বুর্জোয়া জীবনযাত্রার, সচ্ছলতার বৈষয়িক মূল্যগুলোর টোল পিটানো হচ্ছে, ‘গণতান্ত্রিক’ রাষ্ট্র নিয়ে ছড়ানো হচ্ছে আশাঢ়ে গল্প যা নাকি আলাদা আলাদা শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের স্বার্থের উদ্বেগ, সকলকে ‘সমান সুযোগ’ দিচ্ছে, যেমন কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য তেমনি বাস্তব সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মিথ্যার পাহাড় বানিয়ে চলা হচ্ছে, ‘কমিউনিস্ট আগ্রাসনের’ বিপদের ধূয়া তুলে তাকিয়ে তোলা হচ্ছে জঙ্গি মনোবৃত্তি যাতে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধায়োজন সঙ্গত বলে ঠেকে। বারংবার পুনরাবৃত্তির

ফলে এই প্রচারগুলো বর্তমানের বাস্তব জগৎ সম্পর্কে একটা ছকবাঁধা বিকৃত ধারণা সৃষ্টি করে।

নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সমস্ত সদুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বর্তমানের পুঁজিতন্ত্র। তাই বিগত দশকগুলিতে উৎপাদনের কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলির আগে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মজদুর-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে স্থাপিত একটা ব্যবস্থা হিশেবে তার মর্মার্থ বদলায় নি, দূর হয় নি তার চিরকেলে বেকারি, সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা, যুদ্ধের হুমকি। শব্দে তাই নয়, আরো তীব্র হয়ে ফুটে উঠছে পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃতিগত বিরোধ যার পরিণাম আরো বেশি সর্বনাশ।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের অদৃঢ়তা বেড়ে উঠেছে। ৭০'এর দশক থেকে ৮০'র দশকের গোড়ার মধ্যে তিনটে বড়ো বড়ো উৎপাদনী মন্দার মধ্যে দিয়ে গেছে পুঁজিতন্ত্র। ৭০-৮০'র সময়টার অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে আগের চেয়ে ঘন ঘন, ব্যাপ্ত হয়েছে তা সমস্ত উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশে, চরিত্রের দিক থেকে তা বেশি গভীর আর সর্বনাশ। উৎপাদন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কাঁচামাল, জ্বালানী-শক্তি আর বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। এগুলিকে বিশেষ তীব্র করে তোলে মুদ্রাস্ফীতি।

পুঁজিতন্ত্র তার বিরোধগুলি থেকে উদ্ধার পেতে চাইছে অর্থনীতির আরো সামরীকরণ মারফত। সামরিক ব্যয় বাড়ছে অভূতপূর্ব। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রসজ্জার ব্যয় করেছে ট্রিলিয়ন

ডলারের বেশি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা খরচ করেছিল তার তিন গুণ। কেবল ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট উঠেছে ১৬,০০০ কোটি থেকে ২৩,২০০ কোটি ডলারে, অর্থাৎ ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি। কিন্তু সামরীকরণে বেড়ে ওঠে মদ্রাস্থিগীতি, অর্থনীতিতে দেখা দেয় বিষমান্দ্রপাত, অসামরিক শাখাগুলিতে উৎপাদন হ্রাস ও কর্মচ্যুতি।

এসবের ফলে বেড়ে ওঠে মেহনতিদের সামাজিক দুর্দশা, বৈষয়িক ও নৈতিক বণ্ডনা। হ্রাস পায় শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক ভরণপোষণ, বাসগৃহ নির্মাণের খাতে রাষ্ট্রের খরচা। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন রাখা হয় তদবস্থায় অথবা কমে যায়। পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির একটা তীর সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেকারি, যা ছাড়িয়েছে কার্যত সমস্ত ধরনের মেহনতিদের মধ্যে। ২৪টি বিকশিত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশে ১৯৮৩ সালে বেকার বাহিনীতে ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ লোক।

আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বৃদ্ধি, যা প্রকাশ পাচ্ছে সরকারগুলির ঘন ঘন পতনে, লোকসভায় জরুরি নির্বাচনে। ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানাদি ও বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক পার্টিগুলি সংকটে জর্জরিত: হৈ-হৈ পড়ে যাওয়া দুর্নীতিমূলক কারসাজি আর দাঁওবাজির ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বুদ্ধিজীবী নির্বাচন প্রথাও চলেছে প্রগাঢ় সংকটের মধ্যে দিয়ে। নির্বাচকেরা নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছে যে ক্ষমতায় পার্টির বদল হলেও

রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা পরিবর্তন হয় না, আর নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচি পালিত হয় না কখনোই।

৮০'র দশকের গোড়ায় অগ্রণী পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল, নয়ানক্ষণশীল, নয়ানফ্যাসিস্ট প্রবণতার বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। মেহনতিদের প্রতি মারমুখিতার পথ নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় দমনের, স্বেরাচারী, সর্বগ্রাসী পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলায়, অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, সামরিক হঠকারিতায়, রকেট-পারমাণবিক যুদ্ধের খোলাখুলি আয়োজনে।

সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ কমিউনিজমবিরোধিতাতেও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা। বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে কমিউনিজম-বিরোধিতা পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়ার সমগ্র আত্মিক জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে। কমিউনিজম বিরোধিতা হল বদুর্জোয়া ভাবাদর্শের দেউলিয়াপনা, বর্তমান সামাজিক বিকাশের কোনো একটা সদর্থক তত্ত্ব দানে অক্ষমতার প্রকাশ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিকাশের বাস্তবতা আর সমাজ বিকাশের বদুর্জোয়া তত্ত্বের মধ্যে ব্যবধান যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তত বেড়ে উঠছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রতি, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতি আকর্ষণ।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও আগ্রাসনমুখিতার বৃদ্ধি, তার পলিসির জনবিরোধী, মানবতাবিরোধী চরিত্রের তীব্রতা তার পরাজয়েরই সাক্ষ্য। বদুর্জোয়া

সমাজের কানাগলি থেকে বেরবার ঐতিহাসিক যে পথ সেটা একচেটিয়াগড়িলর সর্বশক্তিমত্তার বিরুদ্ধে, শান্তি, গণতন্ত্র আর সামাজিক মুক্তির জন্য পুঁজিতান্ত্রিক দেশগড়িলর মেহনতিদের সংগ্রাম বিকাশের সঙ্গে জড়িত।

একচেটিয়ার বিরুদ্ধে, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগড়িলতে শ্রমিক শ্রেণী হল একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান প্রধান সামাজিক শক্তি। বর্তমান জগতের বৃহৎ এবং টেকনিকের দিক থেকে অগ্রণী বৈষয়িক-উৎপাদনী বনিয়াদের সঙ্গে তারা জড়িত এবং সাম্রাজ্যবাদের পীঠভূমিতে, বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রগড়িলতে শ্রেণী সংগ্রাম চালায়।

বিকশিত পুঁজিতন্ত্রের দেশগড়িলতে শ্রমিক শ্রেণী হল বৈষয়িক সম্পদের প্রধান স্রষ্টা, কিন্তু আগের মতোই সে উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করে দিন চালায়, শোষিত হয়, যে পয়সা পায় সেটা তার ব্যয় করা শ্রমের অনেক কম। সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক পুঁজিতন্ত্রের নতুন কতকগড়িল ঘটনায় শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা আর গুণে (চারিত্রে) বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রমিক শ্রেণীর কোষকেন্দ্র হল শিল্প প্রলেতারিয়েত। এই অংশটাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ, ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত প্রলেতারিয়েত। শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে সংখ্যাবহুল অংশ হল অনুৎপাদক ক্ষেত্রের শ্রমিক। তাদের অনেকেই এসেছে অপ্রলেতারীয় স্তর থেকে।

কিন্তু শ্রমের প্রকৃতি, শিক্ষার মান, বেতন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জীবনযাত্রার পরিস্থিতির দিক থেকে এরা হল শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে নিম্নাংশ। কৃষি উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমছে।

শ্রমিক শ্রেণীর বৃত্তিগত ও দক্ষতামূলক কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটছে। চিরাচরিত জনবহুল পেশাগুলির (টানার, মিলার প্রভৃতি) আপেক্ষিক গুরুত্ব কমছে, সংখ্যা বাড়ছে নতুন নতুন পেশার কর্মীদের: প্রোগ্রামিস্ট, কম্পিউটার-চালক, সংযোজনকর্মী, অ্যাডজাস্টার প্রভৃতির। এদের কাজে দৈহিক পরিশ্রম কম বলে বুদ্ধিজীবী পরিসংখ্যানবিদরা এদের ফেলেন কর্মচারীর কোঠায় এবং তার ভিত্তিতে দেখাতে চান যে শ্রমিকের সংখ্যা কমছে।

প্রচণ্ড বেড়েছে শ্রমের প্রথরীভবন। উৎপাদন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত র‍্যাশনলাইজেশন আর প্রথরীভবনের ফলে শ্রমশক্তি শোষণের মাত্রা অত্যন্ত বেড়েছে। বর্ধিত শোষণের ফলে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শ্রম, জীবনযাত্রা, সামাজিক ভরণপোষণের পরিস্থিতিতে অবনতি ঘটে। মেহনতিদের জীবনযাত্রার মান নেমে যাচ্ছে, মর্দুদ্রাস্ফীতি আর মূল্যবৃদ্ধির ফলে আসল বেতন কমে গেছে সমস্ত বর্গেরই মজদুর-খাটা শ্রমিকদের। সামাজিক প্রয়োজনের খাতে বরাদ্দ হ্রাসে বিশেষ করে মূর্শাকিলে পড়েছে নির্বিশ্রু স্তরের লোকেরা।

অনিবার্য শ্রেণী সংঘাতের আশংকায় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের সহায়তায় আক্রমণ শুরুর করেছে মেহনতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের

ওপর। ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর যৌথ চুক্তির নিকৃষ্ট সব শর্ত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে একচেটিয়ারা, কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়নকে বাতিল করে দিতে চাইছে, কারখানায় শ্রম রক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। ইংলন্ডে রক্ষণশীল পার্টির সরকার 'কর্মসংস্থান' নিয়ে একটি আইন পাশ করেছে যাতে রাস্তায় পিকেটিং করলে ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীকে কারারুদ্ধ করার অধিকার থাকবে কর্তৃপক্ষের। 'বেআইনী ধর্মঘটের' দায়ে ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মামলা করা এবং দণ্ড হিশেবে বিপুল জরিমানা আদায়ের অধিকার পেয়েছে উদ্যোগকর্তারা। পশ্চিম জার্মানিতে 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা' রক্ষার ছুতোয় শাসক মহল শোভাযাত্রা সীমাবদ্ধ করা, 'পেশার ওপর বিধিনিষেধ' পলিসি কঠোর করার অধিকার পেয়েছে। 'পেশার ওপর বিধিনিষেধ' আইনে সরকারী কাজ যথা শিক্ষকতা, ডাক, পরিবহণ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরি থেকে বঞ্চিত থাকবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এবং অন্যান্য 'অনির্ভরযোগ্য' লোকেরা। এই আইন অনুসারে প্রায় বিশ লক্ষ লোককে প্রতি মাসে হাজিরা দিতে হবে থানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট একেবারেই নিষিদ্ধ, প্রায়ই তাদের ট্রেড ইউনিয়নও গঠন করতে দেওয়া হয় না। এই অবস্থার সামাজিক কারণ সম্পর্কে লেনিন বলেছেন: 'যে সমাজ অর্থের প্রতিপত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে সমাজে মেহনতি জনসাধারণ নিঃস্ব হতে থাকে আর মর্ডিষ্টম্য়ে ধনী পরগাছার মতো দিন কাটায়,

সেখানে বাস্তব এবং কার্যকরী 'স্বাধীনতা' থাকতে পারে না।*

অর্থনৈতিক সংকট, মেহনতিদের অধিকারের ওপর একচেটিয়ার হামলায় তীব্র হয়ে উঠেছে শ্রেণী সংগ্রাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে তার অংশীদের জনবহুলতা। সেটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ধর্মঘট আন্দোলনের জোয়ারে, ৭০'এর দশকে ধর্মঘটীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৫ কোটি। ৮০'র দশকের গোড়ায় ধর্মঘট সংগ্রাম আরো প্রবল হয়েছে। উঁচু হয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের সংগঠনশীলতা। সেটা প্রকাশ পাচ্ছে একটা উদ্যোগ বা কোম্পানিতে, তথা শাখা, আঞ্চল, আর দেশব্যাপী আয়তনে কর্মের সমন্বয়ে। ধর্মঘট সংগ্রামগুলিতে দেখা যাচ্ছে বেশি নমনীয় রণকৌশল, রূপ আর পদ্ধতির বৈচিত্র্য। উদ্যোগের ঢালাও পিকেটিং, অবরোধ প্রভৃতি নানা উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। ধর্মঘট সংগ্রামের কৌশল-বৈচিত্র্যে সম্ভব হচ্ছে একচেটিয়া বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শ্রেণীগত সংঘর্ষে বেশি ফললাভ, অপেক্ষাকৃত কম লোকসানে মেহনতিদের নিজের স্বার্থ রক্ষা।

মেহনতিদের সংগ্রাম ক্রমেই আক্রমণাত্মক চরিত্র ধারণ করছে, হয়ে উঠছে জেদী ও একরোখা। শ্রমজীবীদের প্রতিবাদ যাত্রা, 'সংগ্রাম দিবস', 'জাতীয় তৎপরতার দিবস' প্রভৃতি গণ অভিযান তার পরিচায়ক। জাপানে ১৯৬৫ সাল থেকে শুরুর করে প্রতি বছর নিজেদের

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 10, 1978, p. 48.

অধিকার রক্ষায় দেশ জুড়ে মেহনতিরা চালাচ্ছে ‘বাসস্তিক অভিযান’ আর ‘শারদীয় অভিযান’। সভা, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট সহকারে এইসব অভিযানে যোগ দিচ্ছে বহু উদ্যোগের শ্রমিকেরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ চুক্তি পদ্ধতির সম্পাদনের আগে মালিকেরা যাতে শ্রমিকদের নতুন দাবিগুলি মেনে নেয় তার জন্য দীর্ঘকালীন ধর্মঘট চালায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। এই ধরনের সংগ্রাম চালিয়েছে ইস্পাত, মোটরগাড়ি, তৈল প্রভৃতি নানা শিল্পশাখার ট্রেড ইউনিয়ন। এবং বহু ক্ষেত্রে জয়লাভ করেছে শ্রমিকেরা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বিশেষ করে জাতীয় পরিসরে এই ধরনের অভিযান শুধু একচেটিয়াগুলির ওপর নয়, সরকারের নীতির ওপরেও দিতে পারে ‘নিচু থেকে চাপ’।

শ্রেণী সংগ্রাম ইদানীং ক্রমেই স্পষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র নিতে শুরু করেছে। সেটা প্রকাশ পাচ্ছে প্রথমত, অস্ব প্রতিযোগিতা আর পারমাণবিক বিশ্ব যুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নী ফ্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়া আর ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে মেহনতিদের ফ্রিয়াকর্মে; দ্বিতীয়ত, সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে, পুলিসি দমন পীড়নের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সবিশেষ পরিবর্তনের জন্য মেহনতিদের জাতীয় অভিযানে। গণতান্ত্রিক জাতীয়করণ, উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ, শ্রমের বাস্তব অধিকার, একচেটিয়ার একাধিপত্য সংকোচন

ইত্যাদির দাবি করে মেহনতিরা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার কতকগুলি মূলনীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। শ্রমিকবিরোধী, ট্রেড-ইউনিয়নবিরোধী আইনগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের চরিত্র এইরকমই।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পরিপক্বতা ও সক্রিয়তার মান প্রকাশ পাচ্ছে যেমন তাদের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী, তেমনি সংস্কারবাদী পার্টিগুলির ক্রিয়াকর্মে। নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবশালী শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফ্রান্স, ইতালি, পোর্টুগাল, ফিনল্যান্ডের কমিউনিস্ট পার্টিরা। শান্তি আর আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের পক্ষে লড়ছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, ফিনল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলির সমাজতন্ত্রীরা।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে এসে পড়ছে শ্রমজীবীদের নতুন নতুন দল: পৌরসেবা (সার্ভিসিং) স্কেলের কর্মীরা, চিকিৎসাকর্মী, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, কৃষক, সেইসঙ্গে শিক্ষার্থী তরুণ, গৃহিণী, পেনশনভোগীরাও। এটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, কেননা সবাই তারা একচেটিয়াদের চাপ, সংকটজনক ঘটনার পরিণাম অনুভব করে নিজেদের উপর। শান্তি রক্ষায়, অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসানে সবাই এরা সমান আগ্রহী। পূর্জিতান্ত্রিক সমাজে কার্যত জনবহুল এমন একটা সামাজিক গোষ্ঠীও আর নেই যাদের স্বার্থ রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরোধী নয়।

এক কাতারে লড়াই

অগ্রণী পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগদূলিতে শাসক উচ্চকোটি আর জনসাধারণের বিপদলাধিকাংশের স্বার্থবৈপরীত্য এতই প্রকট যে, মনে হবে, সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক বনিয়াদ দ্রুত ধুয়ে-মুছে যাওয়ার কথা। অথচ একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্র টিকেই থাকছে, কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটার কারণ কী?

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আধিপত্য টিকে থাকার কারণ নানাবিধ। প্রথমত সামাজিক-শ্রেণীমূলক আর রাজনৈতিক শক্তিগদূলি বিপরীত মেরুপ্রান্তে এসে দাঁড়াচ্ছে বটে, তবে সেটা সরল রেখায় নয়। যে শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগদূলি অবজেকটিভ ক্ষেত্রে একচেটিয়ার বিরুদ্ধে, তাদের অভ্যন্তরে ভেদাভেদ থাকে তাদের সামাজিক গঠনের বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক স্বার্থের গরমিল, ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, কোনো একটা রাজনৈতিক পার্টির প্রতি চিরাচরিত আনুগত্য ইত্যাদি সবকিছুর দরুন। সংস্কারপন্থী পলিসি আর ভাবাদর্শীয় কলকাঠির সাহায্যে একচেটিয়া বদ্বর্জোয়া তাদের আধিপত্যের ভিত্তিস্বরূপ একটা সামাজিক জোটের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। শূদ্ধ ছোটো আর মাঝারি বদ্বর্জোয়ারাই নয়, বদ্বিজীবী, কর্মচারী, এমনকি কৃষকেরাও অবিরাম একচেটিয়া পুঞ্জির পীড়ন সহ্য করে গেলেও তার সঙ্গেই নিজের ভাগ্য জড়িয়ে নেয়। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের অভাবও থাকে। শ্রমিকদের একাংশ যায় কমিউনিস্টদের পক্ষে, অন্যেরা সমর্থন করে

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের, তৃতীয় একটা অংশ তাদের ফ্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে কেবল ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে, আরেকটা অংশ প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সমেত বর্জুয়া পার্টি আর সংগঠনেরই পেছনে যায়, কিছদ্র শ্রমিক আবার মনে করে যে 'রাজনীতির বাইরে' থাকাও সম্ভব। এসবের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশে মদ্রশকিল হয়, কমে যায় মেহনতিদের সংগ্রামের ফলপ্রদতা। বিভেদ বিদূরণ, বৈপ্লবিক ভিত্তিতে সমস্ত মেহনতির কর্মের ঐক্য স্থাপন ছিল এবং এখনো রয়ে গেছে বিকশিত পদ্বিজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমস্যা। কেবল নিজেদের পঙক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেই শ্রমিক শ্রেণী নিজের চারপাশে সংখ্যাগদ্রদ্র গণতান্ত্রিক অংশকে জুড়টিয়ে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাস্তব ভারাদিক্যা অর্জন করতে পারে।

ঠিক এই অবস্থান থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলি দ্রুনিয়ার এই অংশটায় বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত দেখে থাকে। তাদের ফ্রিয়াকলাপের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদ, নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, শ্রেণী সংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতা বিচার করে বৈপ্লবিক তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ।

উচ্চ বিকশিত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বৈষয়িক পদ্রবশর্ত পেকে উঠলেও বিপ্লবের পথে যে অনেক মদ্রশকিল থাকবে, সেটা লেনিন আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বদ্রুঝেছিলেন যে এখানে সবচেয়ে

শান্তিশালী, সবচেয়ে সংগঠিত, সবচেয়ে অভিজ্ঞ
বুর্জোয়ার সম্মুখীন হতে হবে শ্রমজীবীদের।* তাই
প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে কঠিন যে কর্তব্য আগেও
ছিল এবং এখনো রয়েছে, সেটা হল একচোঁটয়া
বুর্জোয়ার ক্ষমতা উচ্ছেদ করা, খোদ সমাজতান্ত্রিক
বিপ্লবটাই ঘটানো। নিজের অনুগামীদের জন্য বৈপ্লবিক
সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল দিতে গিয়ে লেনিন
লেখেন, 'যে মূর্ত-নির্দিষ্ট পথটা অথবা ঘটনাধারার
বিশেষ বাঁকটা জনগণকে নিয়ে যাবে সত্যকার, বন্ধপারিকর,
সর্বশেষ মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামে, সেটা খুঁজে পাওয়া,
হাতড়ে দেখা, সঠিক নিরূপণ করতে পারাই হল পশ্চিম
ইউরোপ ও আমেরিকায় সাম্প্রতিক কমিউনিজমের
প্রধান কর্তব্য।'***

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে লেনিন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের
সঙ্গে অবশ্যই এক করে কখনো দেখেন নি। সমাজতন্ত্রে
উত্তরণের বহুবিধ রূপের কথা বলেছেন তিনি, বিপ্লব
আর সংস্কারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ দেখবার
শিক্ষা দিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের দৃঢ়
বিরোধিতা করে তিনি সংস্কার ও বিপ্লবের মধ্যে গুরুগত
পার্থক্যে, সূর্যনির্দিষ্ট বৈপরীত্যে জোর দিয়েছেন:
'সংস্কার হল প্রভুত্বকারী শ্রেণীর প্রভুত্ব বজায় রেখে
তার কাছ থেকে পাওয়া আসলে একটা ছাড়। বিপ্লব

* See: Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 27,
p. 547.

** Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 31, p. 97.

হল প্রভুত্বকারী শ্রেণীর উচ্ছেদ।* তবে এই কথাটাকে একেবারে পরম করে তোলেন নি তিনি। বিপ্লব থেকে সংস্কারের গদুগত পার্থক্য দেখিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘এই বৈপরীত্যের বিস্মরণ, দুই বোধ যে সীমাচিহ্নে বিভক্ত তার বিস্মরণ অবিরামপেঁছয় সমস্ত ঐতিহাসিক বিচারে অতি গুরুতর ভ্রান্তিতে। কিন্তু বৈপরীত্যটা পরম নয়, সীমাটা মৃত নয়, জীবন্ত, সচল, আলাদা আলাদা প্রতিটি মৃত-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সেটা স্থির করে নিতে পারা চাই।’** সংস্কারের তাৎপর্য যেমন বাড়িয়ে দেখা, তেমনি তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব, দুই-ই মার্কসবাদের কাছে বিজাতীয়। দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের মতোই সমান দৃঢ়ভাবে লেনিন বিরোধিতা করেছেন বামপন্থী স্বেচ্ছাবাদীদেরও, যারা বিপ্লব ঘটাবার মতো প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পেকে উঠেছে কি ওঠে নি, তা নির্বিশেষে সামাজিক পুনর্গঠনের কেবল ‘বৈপ্লবিক রূপটাই’ স্বীকার করত।

মেহনতিদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় যা দেখা গেছে, সংস্কারের তাৎপর্য সর্বদা একই রকমের নয়। বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে উৎক্রমণ তাতে যেমন আটকে থাকতে, তেমনি স্থগিতও হতে পারে। সংস্কারের গভীরতা ও সামাজিক পরিণাম নির্ভর করে কে সংস্কার সাধন করছে, তার ওপর — বিদ্যমান ব্যবস্থা বজায় রাখার স্বার্থে অধিপতি শ্রেণীটি নিজেই, নাকি সংস্কারটা

* Ibid., Vol. 29, p. 515.

** Ibid., Vol. 17, 1974, pp. 115-116.

ঘটছে অধিপতি শ্রেণীদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও মেহনতিদের চাপে। প্রথম ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীরা সংস্কার কাজে লাগায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য। দ্বিতীয় ধরনটার দৃষ্টান্ত হতে পারে গণতান্ত্রিক সংস্কার, যা শাসক শ্রেণীদের প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও কার্যকর হয় বিপুল শ্রমিক আন্দোলনের ফলে, 'নিচুতলাকার চাপে'। এই ধরনের সংস্কারকে কমিউনিস্ট পার্টির মনে করে মেহনতিদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামের অন্তর্বর্তী ধাপ, বৈপ্লবিক রূপান্তরে জনগণকে পৌঁছে দেবার উপায়।

বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপক জোয়ার। কমিউনিস্টরা বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব মনে রাখে, যথা: গণতান্ত্রিক ও পার্লামেন্টী ঐতিহ্যে, বহু পার্টির অস্তিত্বে, শাসক পার্টি ও বিরোধী দলের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে জনগণের আসক্তি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গণতান্ত্রিক অধিকারাদি শ্রমজীবীরা অর্জন করেছে দীর্ঘ ও একরোখা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বনিয়াদি কর্তব্য হল একচেটিয়ার হামলা থেকে এসব অধিকার রক্ষা করা। কমিউনিস্টরা বিবিধ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং মনে করে যে শাসকদের ক্ষমতা কমিয়ে গণতন্ত্রের নতুন একটা উচ্চতর ধাপে ওঠা আর পরে ক্ষমতা থেকে একচেটিয়া বুর্জোয়াকে অপসারণের জন্যই তা কাজে লাগানো সম্ভব।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশের এইরূপ পরিপ্রেক্ষিত থেকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি তাদের কর্মসূচিতে শ্রমিক শ্রেণী ও তার সহযোগীদের পক্ষে নির্বাচকদের অধিকাংশকে টেনে এনে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার শান্তিপূর্ণ, পার্লামেন্টী পথকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৭০'এর দশকে এবং ৮০'র দশকের গোড়ায় বিকশিত পুর্জিতান্ত্রিক দেশগুলির একসারি কমিউনিস্ট পার্টি 'গঠনমূলক ক্রিয়ার' কর্মসূচি পেশ করেছে। প্রতিটি দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করে কমিউনিস্টরা গণতান্ত্রিক জাতীয়করণ ও অর্থনৈতিক বিকাশের গণতান্ত্রিক প্রোগ্রামবন্ধন, উৎপাদনের পরিচালনায় শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, বেকারি হ্রাসের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ মেহনতিদের অনুকূলে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন দাবি করেছে। 'গঠনমূলক ক্রিয়ার' সূচিতে আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সংবাদ মাধ্যম ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, দূর্নীতি, অপরাধপ্রবণতা, সন্ত্রাসবাদ, মাদকসেবন, বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট সব প্রস্তাব। এইসব কর্মসূচিতে যেসব দাবি ও প্রস্তাব আছে, তাতে অধিকাংশ সামাজিক গ্রুপ ও স্তরের স্বার্থ মেটে, তাই তা হতে পারে তাদের মিলিত কর্মের ভিত্তিস্বরূপ।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যে কর্মসূচি রচনা করেছে তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সাংগঠনিক-রাজনৈতিক, ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ অবকাশ থাকছে যেখানে

কমিউনিস্টরা আছে কোআলিশন সরকারে অথবা বড়ো
বড়ো মিউনিসিপ্যালিটি আর স্থানীয় ক্ষমতার নেতৃত্বে।
যতটা সম্ভবপর তার কাঠামোর মধ্যে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন
চালিয়ে কমিউনিস্টরা কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দেয় যে
উৎপাদন ও মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব নতুন
সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, পুঞ্জিতান্ত্রিক সম্পর্ক তার সঙ্গে
খাপ খায় না, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রয়োজন।

একাদশ অধ্যায়

নিপীড়িত জাতিদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য

পুঁজিতান্ত্রিক পীড়নের বিরোধিতা করে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার জনবিরোধী পলিসির বিরোধিতা করে বর্তমান যুগে বিশ্বের নবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ নিচ্ছে বিপুল সংখ্যক লোক। অতি জনবহুল একটা বৈশ্ববিক আন্দোলন হল জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোটি কোটি লোক।

বর্তমান কালের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রসারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। পুঁজিতন্ত্র কেবল মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের নয়, জাতীয় পীড়নের, এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতিকে

শোষণেরও একটা ব্যবস্থা। লেনিন যা বলেছেন, বিশ শতকের গোড়ায় 'পুঞ্জিতন্ত্র পরিণত হয়েছে ঔপনিবেশিক পীড়নের, মর্ডাণ্টমেয় 'অগ্রণী' দেশ কর্তৃক পৃথিবীর অত্যাধিকাংশ অধিবাসীদের আর্থিক স্বাসরোধের একটা ব্যবস্থায়'।* মর্ডাণ্টমেয় উৎপীড়ক দেশ আর অধিকাংশ ঔপনিবেশিক, শোষিত দেশে বিশ্বের ভাগাভাগি হল সাম্রাজ্যবাদের একটা মূলগত দিক।

জাতীয় মুক্তির জন্য লোকেদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করে। বিশ্ব রণাঙ্গনে সমাজতন্ত্র ও পুঞ্জিতন্ত্রের মধ্যে শক্তির যে অনুরূপাত গড়ে উঠেছে, তাই দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নিগড় থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির মুক্তিলাভের প্রক্রিয়া। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিণামে পতন ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার, গড়ে উঠেছে একসারি নবীন জাতীয় রাষ্ট্র। এইসব দেশের জনগণের জাতীয় সার্বভৌমত্বের সূচনাশ্রিতি হল সাম্রাজ্যবাদের ওপর এইসব দেশের জনগণের বিপুল বিজয় এবং তাতে সূচিত হয়েছে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ফলে ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক জনগণের পক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামের রণাঙ্গনে একটা নির্দিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 22, 1977, p. 191.

ঔপনিবেশিক নিগড় থেকে মুক্তির ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জনগণের সামনে যুগ যুগের পশ্চাৎপদতা ও জনগণের নিঃস্বতার অবসান, সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক প্রভুত্বের বিলোপের লক্ষ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চালাবার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেক দেশে এই কাজটা করা হচ্ছে সমস্ত ধরনেরই শোষণ বিলোপের উদ্দেশ্য নিয়ে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ভিত্তিতে। সত্যকার স্বাধীনতা অর্জন আর সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে এগিয়ে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রয়াসে প্রকাশ পাচ্ছে বর্তমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রগতিশীল প্রবণতা।

ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য কী? নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক স্বার্থ অবজেকটিভ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার দেশগুলির স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়। এর মধ্যে পড়ে সর্বাপ্রাে ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত বিলোপের জন্য, জাতিতে জাতিতে শান্তি ও মৈত্রীর জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সমাজতান্ত্রিক দেশ আর স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সমাধিকার ও মিত্রতার সম্পর্ক।

কিন্তু অর্থনীতির দিক থেকে এইসব রাষ্ট্র এখনো রয়ে গেছে বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা অসমান, অধীনতামূলক অবস্থায়। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আর প্রাক্তন উপনিবেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক

বিকাশের মাত্রায় পার্থক্য বিপুল। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বহু দেশের জনগণের লুণ্ঠন চালিয়েই যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা। ভূতপূর্ব উপনিবেশ আর পরাধীন দেশগুলি থেকে প্রতি বছর শত শত কোটি ডলার তারা চুষে নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে শোষণের অবসান ঘটাতে হলে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, তা নইলে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, বা জাতীয় পুনর্জন্ম, কিছুই সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আর প্রগাঢ় সামাজিক পুনর্গঠন হয়ে দাঁড়াচ্ছে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলির বিকাশের বর্তমান পর্যায়ের মূলকথা।

এই কর্তব্য সাধনে বাধা দিচ্ছে নয়া-ঔপনিবেশিকতার সাম্রাজ্যবাদী পলিসি। সোজাসুজি আক্রমণ ও সামরিক ব্লক গঠন, রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের উৎকোচে ক্রয় থেকে শুরু করে অসুবিধাজনক সরকারগুলির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর কু-দেতা প্রভৃতি নানান পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয় নয়া-ঔপনিবেশিকতায়। তবে নয়া-ঔপনিবেশিক পলিসির মূলকথাটা থেকে যায় একই: উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের আওতার মধ্যে ধরে রাখা, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতি, সত্যকার জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে বাধা দেওয়া।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক পরাধীনতা বজায় রাখতেই শূদ্ধ নয়, সেখানে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক পাকা করতেও চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদ। এইসব

কাজ করা হয় যেমন এক-একটা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, তেমন দল বেঁধেও। নয়া-ঔপনিবেশিকতার যৌথ পলিসির নিদর্শন হল ৫৪টি উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে জড়িত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিমেল। এর সাম্রাজ্যবাদী পার্টনারদের মতলবে হল ইউরোপের বারোয়ারী বাজারের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বেশি করে জড়িয়ে নেওয়া এবং তাতে করে সেসব দেশে অধীনতামূলক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা নিশ্চিত করা।

বাস্তব ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, যেসব ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে গেছে, মর্দুত্তলাভের পর বহু দশক কেটে গেলেও সেখানে উল্লেখযোগ্য সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন বিশেষকিছু হয় নি। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপের দিকে যাওয়ার ফলেই সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় উন্নয়নশীল দেশেরা। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পেরেছে যে নিজেদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আর অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তারা সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে পারে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাকে দুর্বল করে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার জন্য। যেমন, ৭০'এর দশকটা 'তেলের দরে বিপ্লবের' পর্ব বলে পরিচিত, এ বিপ্লব ঘটে তৈলোৎপাদক উন্নয়নশীল দেশগুলির একদল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে। এই দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশও বিশ্বের বাজারে প্রধান প্রধান

অর্জৈব ও কৃষিজাত কাঁচামালের সরবরাহক হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে শুরুর করেছে। প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশেরা তাদের পাঠানো কাঁচামালের ওপর কতটা নির্ভরশীল তা বিচার করে তারা খনিজ কাঁচামাল আহরণের শর্ত সংশোধন, রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছে। এতে করে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম চালাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশেরা।

গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা, সাহায্য করেছে কার্যত তা প্রবর্তনে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সমাধিকারমূলক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে তারা যাতে ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ পুষ্ট হচ্ছে। পরস্পর লাভজনক বাণিজ্য ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নবীন রাষ্ট্রগুলির জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শাখাগুলির রূপলাভে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যেমন, ৮০'র দশকের গোড়ায় অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের দেশগুলি ৯২টি উন্নয়নশীল দেশকে অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সাহায্য দিচ্ছিল। তাদের সহায়তায় এখানে নির্মিত হচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৫ হাজার উদ্যোগ, তার অর্ধেকের বেশি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ওপর নবীন দেশগুলির আস্থা টলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীরা সাম্রাজ্যবাদ ও উন্নয়নশীল দেশগুলির

মধ্যে বাস্তব বিরোধকে দেখাতে চায় ‘ধনী উত্তর’ আর ‘দরিদ্র দক্ষিণের’ মধ্যে বিশ্বের এক কল্পিত ভাগাভাগি বলে। এই ভাবাদর্শীয় চালাকিটার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হল সদ্যোমুত্ত জাতিদের অর্থনৈতিক বিকাশে যেসব মূর্খাকিল দেখা দিচ্ছে তার দায় সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির দেশগুলির ওপরেও চাপানো, উত্তরের দেশ হওয়ায় তারা যেন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার শরিক। এতে করে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে বিযুক্তি ঘটাবার চেষ্টা হয়। একদল দেশকে অন্যদলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদীদের একটা প্রচলিত কৌশল। সেটা তারা করতে পারলে জাতীয় স্বার্থের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রগতিশীল শক্তির আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার বিভেদমূলক ক্রিয়াকলাপের স্বরূপ উন্মোচন করে সুদৃঢ় করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে উন্নয়নশীল ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির একাত্মতা।

উন্নয়নশীল দেশগুলির ঐক্যে সাহায্য করে জোট-বহির্ভূতের আন্দোলন। এ আন্দোলন হল মুক্ত রাষ্ট্রগুলির একটা সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন। বর্তমানে প্রায় ১০০টি রাষ্ট্র তার অন্তর্ভুক্ত, লোকসংখ্যা তাদের দেড়শ কোটি। এ আন্দোলনের মূলনীতিগুলি সুদৃবন্ধ হয়েছে কর্মসূচিগত দলিলাদিতে, যথা, সামরিক-রাজনৈতিক ব্লকে যোগদান থেকে বিরতি, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, নর-ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে শান্তি ও আন্তর্জাতিক

নিরাপত্তা সংহতির জন্য সংগ্রাম। বর্তমান কালের মূলগত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ন্যায্য ও পাকাপোক্ত শান্তির জন্য সংগ্রামের প্রশ্নে সমাজতান্ত্রিক সহমিতালির আর জোট-বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলির অবস্থান একই অথবা খুবই কাছাকাছি।

নেতৃত্বে কে?

বর্তমান কালের জাতীয় মুক্তি বিপ্লবগুলি দুটি কর্তব্য পালনে আহুত। প্রথমত ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিলোপ, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশাসন যন্ত্রের উচ্ছেদ; জাতীয়, উপজাতীয়, ধর্মীয় প্রভৃতি শত্রুতার অবসান। এটা বিপ্লবের গণতান্ত্রিক কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, আধুনিক উৎপাদনের যথাসম্ভব দ্রুত বিকাশ, জনগণের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সামাজিক বৈসাদৃশ্য বিলোপের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি। প্রয়োজন এমন সামাজিক সম্পর্কে উত্তরণ যা ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত। এটা হল বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য।

তাই জাতীয় মুক্তি বিপ্লব হল সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির, সমস্ত অসমাপ্তিকারী জাতিদের মুক্তি, জাতীয় আত্মনির্ধারণ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য অর্জিত সার্বভৌমত্বকে ব্যবহারের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। চরিত্রের দিকে থেকে এ হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী,

সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব। জাতীয় মুক্তি বিপ্লব সাধনে সংঘাতে আসে দুটি প্রবণতা: বেশি বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে উত্তরণ।

পথ নির্বাচন নির্ভর করে যেমন জাতীয় মুক্তি বিপ্লব বিকাশের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, তেমনি প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির অনুপাতের ওপর। বিপ্লবের চালিকা শক্তির চরিত্র নির্ধারিত হয় প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসীদের সামাজিক শ্রেণীগত বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য দিয়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করে গত শতকের গোড়ায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পতিত হয় প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধীনতায়। তাহলেও অপেক্ষাকৃত উচ্চ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশে লাতিন আমেরিকান দেশগুলি চিহ্নিত। এখানে সংখ্যায় বেড়ে উঠছে ও প্রবল হচ্ছে শহুরে ও গ্রাম্য প্রলেতারিয়েত, তারাই কর্মক্ষম লোকেদের এক-চতুর্থাংশ এবং বেশি। শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী হল কৃষক, তারা অধিবাসীদের অধিক। মেহনতিদের ব্যাপক স্তরের বিরুদ্ধে রয়েছে অল্প কিছু প্রতিগ্রন্থাশীল একচেটিয়া বুর্জোয়া আর আবাদ-মালিকদের অর্থপতি গোষ্ঠী, যারা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনে পড়ত। এই দেশগুলিতে সাধারণত প্রভুত্বকারী শ্রেণী হল জাতীয় স্বার্থবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের

পক্ষপাতী শক্তির। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর সত্যকার জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রাম এখানে জড়িয়ে যায় পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে, বিদেশী ও স্থানীয় একচেটিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে। এ সংগ্রামের সর্বাধিক সঙ্গতিপরায়ণ পরিচালক হিসেবে এগিয়ে আসছে কমিউনিস্ট পার্টি। অধিকাংশ লাতিন আমেরিকান দেশে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের বৈষয়িক পূর্বশর্ত পেকে উঠেছে। সেটা সমর্থিত হয়েছে কিউবার, নিকারাগুয়ার অভিজ্ঞতায়। বর্তমানে বিশ্বের এই অঞ্চলটায় প্রবল হয়ে উঠছে জঙ্গি গণতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন, যা সমাজতন্ত্রের পথ খুলে দিচ্ছে জনগণের সামনে।

উত্তর আফ্রিকা আর পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে তাদের স্বাধীনতা লাভের সময় পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে বজায় ছিল সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কও। পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সমাজের তদনুরূপ সামাজিক-শ্রেণীগত বিভাগ: দেখা দিয়েছিল জাতীয় বুদ্ধিজীবী (শহুরে এবং গ্রাম্য), শিল্প ও কৃষির প্রলেতারিয়েত, কারুশিল্পী-কুটির শিল্পী, কৃষক সম্প্রদায় খুদে ও মাঝারি মালিক, খাজনাদায়ী কৃষক আর খেতমজুরে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল। অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘাঁটি হিসেবে রয়ে গিয়েছিল সামন্তরা। সংখ্যাবহুল শ্রেণী ছিল কৃষক, সমগ্র অধিবাসীর ৭০-৭৫ শতাংশ। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয় জাতীয় বুদ্ধিজীবী। নবীন শ্রমিক শ্রেণী সংখ্যাবহুল না হলেও মূর্খতা আন্দোলনে

মেহনতিদের সর্বাধিক সংগঠিত ও সচেতন বাহিনী
হিশেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ;
ওশিয়ানিয়ার অর্থনৈতিক গঠনে বৈচিত্র্য অনেক বেশি।
অত্যাধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক, সামন্ততান্ত্রিক আর
কৌলিক-উপজাতীয় সম্পর্ক ভেঙে পড়ার বিভিন্ন স্তরে
তাদের অবস্থান। এইসব দেশের মুক্তি আন্দোলনে
নেতৃত্ব নিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক গ্রুপের
প্রতিনিধি, বেশির ভাগই তারানবীন জাতীয় বুদ্ধিজীবী
সম্প্রদায়ের লোক।

উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশেরই আছে নিজস্ব মূর্ত-
নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য।
জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের চালিকা শক্তির বিশ্লেষণে
সেগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। অবজেকটিভ ক্ষেত্রে
জাতীয় মুক্তিতে যেসব সামাজিক স্তর আগ্রহী, তারাই
অধিবাসীদের অত্যাধিকাংশ, তাদের মধ্যে ফেলা যায়,
কৃষকদের, শ্রমিক শ্রেণী, জাতীয় বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবী
এবং অন্যান্য অন্তর্বর্তী স্তরকে। তবে এক-একটা দেশের
পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা আর তাৎপর্য হতে পারে
বিভিন্ন।

নিজেদের গড়ন আর রাজনৈতিক প্রয়াসে উন্নয়নশীল
দেশের জাতীয় বুদ্ধিজীবী সমগোত্রীয় নয়। বিভিন্ন দেশে
জাতীয় বুদ্ধিজীবীর প্রতিটি স্তরের রাজনৈতিক প্রভাবের
মাাত্রা ও অনুপাত বিভিন্ন রকমের। সামন্ততন্ত্র আর
বিদেশী পুঁজির সঙ্গে জাতীয় বুদ্ধিজীবীর বিরোধের
তীক্ষ্ণতাও বিভিন্ন মাাত্রার। মুক্তি বিপ্লব বিকাশের

গতিপথে জাতীয় বুদ্ধজোয়ার ভূমিকা বদলাতে থাকে। বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে তার কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ঔপনিবেশিক আর সামন্তদের সঙ্গে বিরোধ। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর ভূতপূর্ব সহযোগী, মেহনতিদের সঙ্গে বিরোধটাই হয়ে ওঠে প্রধান। বুদ্ধজোয়ারা যেন তাদের 'ফ্রন্ট বদলার', প্রগতিশীল শক্তি থেকে পরিণত হয় প্রতিক্রিয়াশীল। বেশ কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় বুদ্ধজোয়ারের কোনো কোনো স্তর ক্ষমতায় আসার পর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে। অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে বুদ্ধজোয়া, তাদের প্রভাবশালী স্তরটা সাধারণ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে জনগণের সঙ্গে চলে, জাতীয় মনুষ্টি আন্দোলনে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ দেশে জাতীয় বুদ্ধজোয়ার মধ্যে ভাঙন ঘটেছে, তার স্তর ও গ্রুপগুলি দুই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় বুদ্ধজোয়ার প্রকৃতিগত বৈত প্রকাশ পায় বিভিন্ন রূপে: কতকগুলি দেশে এখনো প্রাধান্য থাকছে তাদের গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিকগুলির, অন্য কতকগুলি দেশে বুদ্ধজোয়া তাদের প্রগতিশীলতা হারিয়েছে, জাতীয় মনুষ্টি বিপ্লবের পরিচালক শক্তি হতে তারা অক্ষম, কিছু দেশে আবার তাদের রাজনীতিতে মেলে প্রগতিশীল আর প্রতিক্রিয়াশীল দুই দিকই।

উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিক শ্রেণীও বিভিন্ন প্রকারের। কতকগুলি দেশে তারা প্রধানত বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রগুলির শিল্প প্রলেতারিয়েত, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির

নেতৃত্বাধীন, জাতীয় মদ্যুত্তি আন্দোলনের অগ্রবাহিনী। অন্য কতকগুলি দেশে তারা এমন শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা সবে দানা বাঁধছে, তাদের মধ্যে মরশুমী, কৃষিজীবী, শিল্পবাহিত উপস্থিত রয়েছে অনেক, স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসতে এখনো অক্ষম।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সামাজিক বিকাশের দ্বারা বহু দিক থেকে নির্ভর করে সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে রাষ্ট্রের পরিচালনা গ্রহণ করেছে সৈন্যবাহিনীর লোকেরা, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী শক্তির স্বার্থবাহক তারা: কোনো কোনো দেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া, কোথাও আবার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধি।

সদ্যোন্মুক্ত দেশগুলিতে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান প্রশ্ন হল জাতীয় মদ্যুত্তি বিপ্লবের কোন ধারাটা জয়লাভ করবে: পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ নাকি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে জড়িত ধারাটা।

‘পুঁজিতান্ত্রিক প্রকারভেদের’ কানাগলি

সদ্যোন্মুক্ত দেশগুলির অধিকাংশই চলেছে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশের পথে। ক্ষমতায় এসে জাতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের অনুসৃত পলিসির নানান রকমফের সত্ত্বেও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে নিজেদের শ্রেণী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত। বলাই বাহুল্য

সামন্ততান্ত্রিক, ততোধিক কৌলিক-উপজাতীয় ব্যবস্থার চেয়ে পুঞ্জিতন্ত্র সমাজবিকাশের একটা উচ্চতর ধাপ। কিন্তু এসব দেশে পুঞ্জিতন্ত্রের বিকাশ একটা সীমাবদ্ধ, বিকৃত, চূড়ান্ত রকমের বিরোধগর্ভ চরিত্র ধারণ করে। তার কারণ, প্রথমত, উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির পুঞ্জিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, জাতীয় বুদ্ধিজীবীর প্রভুত্বকারী ব্রহ্মপুঞ্জগুলির শ্রেণী স্বার্থ।

পুঞ্জিতন্ত্রের 'বিলম্বিত' বিকাশের ফলে ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলি থাকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় একটা অসমান, অসুবিধা জনক অবস্থায়। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুন পুঞ্জিতান্ত্রিক উদ্যোগ বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত। যেমন, নতুন একটা উদ্যোগ গড়া এবং তাতে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হলে শুল্ক পুঞ্জ থাকাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য নির্মাণোপকরণ, বিদ্যুৎশক্তি, জল সরবরাহ, পরিবহণ পথ, কাঁচামাল, ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করতে হয়, যন্ত্রপাতির কথা তো ধরলামই না, যা সাধারণত কিনতে হবে বিদেশে। আর পশ্চাৎপদতার পরিবেশে এসব প্রায়ই হয়ে ওঠে না। তাছাড়া উদ্যোগের জন্য সুদৃঢ় শ্রমিক শক্তি, টেকনিসিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, পরিচালক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে গেলেও মর্শুকিল দেখা দেয়। দেশেই এসব কর্মী গড়ে তোলার সুযোগ, সাধারণত, বড়ো একটা থাকে না, থাকলেও কমই, আর তার জন্য তাদের বিদেশে পাঠানো একাধারে সময়- এবং ব্যয়সাপেক্ষ। অভ্যন্তরীণ বাজার তেমন বিকশিত না হওয়ায় উদ্যোগকে খানিকটা

এককোণে পড়ে থাকতে হয়, উৎপাদনের ক্ষমতা পুরো ব্যবহৃত হয় না, লোকসান যায় অনেক, প্রতিযোগিতা সংগ্রামে পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে বেশি।

অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার ফলে কার্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ তার নয়া-ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়, চেষ্টা করে বিশ্ব পুঞ্জিতন্ত্রের প্রত্যন্ত যেন থাকে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলির ওপর নির্ভরশীল।

যেসব দেশে বহু বর্জ্যের প্রধান্য, সেখানে তার শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে ব্যাপক জনস্বার্থের নৈপরীত্য বেড়ে উঠছে। নবীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে ছোটো ও মাঝারি বর্জ্যেরা ক্ষমতায় এসে র্যাডিকেল সংস্কারের কর্মসূচি কোথাও ঘোষণা করলেও, সঙ্গতির সঙ্গে তার রূপায়ণ হচ্ছে না। পুঞ্জিতান্ত্রিক যেসব সম্পর্ক ক্রমেই প্রধান্য লাভ করছে, তাদের মূলকথা এসব সংস্কারে বদলাচ্ছে না। বিলুপ্ত হচ্ছে না পুঞ্জিতান্ত্রিক বিশ্ব বাজারের নিকট অধীনতা, পুঞ্জিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকৃতিগত সংকটমূলক ব্যাপারাদিই বেড়ে উঠছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে বহুজাতিক একচেটিয়াগুলির নিকট অধীনতা। গড়ে উঠছে বর্জ্যেরা সঙ্গে স্বার্থাবদ্ধ বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র।

অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় সেক্টর পরিণত হচ্ছে আমলাতন্ত্রীদের সমৃদ্ধির উৎসে, সুবিধালাভের উপায়ে। কুপরিচালনা, বেব্যবস্থাপনা, উৎপাদনে নৈরাজ্যের ফলে এই সেক্টর ক্রমেই তার প্রগতিশীল ভূমিকা হারাচ্ছে। কৃষি সংস্কার কার্যকৃত হচ্ছে না, বহু সম্পত্তিধরদের

সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, শ্রমিক, কৃষক, কারুজীবীদের সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রক্রিয়া থাকছে আটকে। তাই, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে ব্যাপক জনগণের মর্দুতি বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি, কিছুই ঘটে না, কেননা দুটোই নির্ভর করে উৎপাদনী শক্তি বিকাশের ওপর ততটা নয়, যতটা জনগণ তার অধিকারী কিনা তার ওপর। লাতিন আমেরিকান দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা তার সাক্ষ্য।

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেড়শ' বছর ধরে লাতিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলি পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের যথেষ্ট দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে, কিন্তু আজও তারা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদদের সারিতে। তার কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উপর খুবই নির্ভরতা, বহু বছর ধরে বৈদেশিক পুঁজি কর্তৃক তাদের সম্পদের লুণ্ঠেরা শোষণ। এই অবস্থায় এ দেশগুলির শিল্প বিকাশ বহু বছর ধরে আটকে থেকেছে, গ্রামাঞ্চলে আধা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় থাকায় সাহায্য হয়েছে, বেড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক বিধ্বস্তপাত, সামাজিক বৈসাদৃশ্য। বৈদেশিক একচেটিয়াগুলির বিরুদ্ধে মেহনতিদের শ্রেণী সংগ্রাম সামলাতে না পেরে সাম্রাজ্যবাদ প্রায়ই এসব দেশে সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব স্থাপন, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খোলাখুলি হস্তক্ষেপের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

জাতীয় মর্দুতি আন্দোলনের সাধারণ জোয়ারের পরিস্থিতিতে লাতিন আমেরিকার জনগণ ক্রমেই যোগ

দিচ্ছে বিপ্লবী প্রক্রিয়ায়। এখানকার মেহনতি জনগণ লড়ছে সত্যকার জাতীয় স্বাধীনতা, সমস্ত ধরনের শোষণ বিলোপের জন্য। এ সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শ্রুদ্ধ মেহনতিদের নিয়ে নয়, অপ্রলোভনীয় স্তরগুলি নিয়েও সমস্ত গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ব্যাপক ফ্রন্ট। ৭০-৮০'র দশকে মধ্য আমেরিকা আর কেরিবিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চলে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তা নতুন করে এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে লাতিন আমেরিকায় পরনির্ভর বিকাশের 'পুঞ্জিতান্ত্রিক প্রকারভেদের' সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়েছে, এখানকার জনগণকে ঠেলে দিয়েছে পুঞ্জিতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তায়।

সমাজতন্ত্রের দিকে

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের অগ্রবাহিনীতে রয়েছে সমাজতন্ত্রের পথে বিকাশমান রাষ্ট্রগুলি। নিজেদের অভিজ্ঞতায় এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় সদ্যোমুত্ত দেশের জনগণ ক্রমেই নিঃসন্দেহ হয়ে উঠছে যে অর্থনীতির অগ্রগতি, বুদ্ধিমত্তা ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পুঞ্জিতন্ত্র অক্ষম। তাই সদ্যোমুত্ত দেশেরা ক্রমেই বেশি করে তাদের সম্মুখস্থ সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করছে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে।

জাতীয় মর্দুতি বিপ্লব সমাজতন্ত্রে পরিবিকশিত হতে

পারে, এমন সম্ভাবনার কথা বলে গিয়েছিলেন লেনিন। এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ছিল যে ঔপনিবেশিক পীড়ন, পরাধীনতা, পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে মানবজাতির অধিকাংশের সংগ্রাম পরিবিকশিত হবে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এবং পিছিয়ে-থাকা জনগণ সে সংগ্রামে নিভঁর করতে পারবে সমাজতান্ত্রিক দেশেদের ওপর। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ‘অগ্রণী দেশগুলির প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে পশ্চাৎপদ দেশেরা সোভিয়েত ব্যবস্থায় এবং বিকাশের নির্দিষ্ট একটা পর্যায়ের পর পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় এড়িয়ে কমিউনিজমে চলে আসতে পারে।’* ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। বিকাশের পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় এড়িয়ে জার রাশিয়ার ভূতপূর্ব প্রত্যন্তাঞ্চল, সোভিয়েত জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলির জনগণ উপনীত হয়েছে সমাজতন্ত্রে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় মঙ্গোলিয়ার জনগণ সমাজতন্ত্রে পৌঁছিয়েছে সোজাপুঁজি সামন্ততন্ত্র থেকে। বর্তমানে আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশ কিছু দেশ বিকশিত হচ্ছে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে।

আমাদের যুগে পুঁজিতন্ত্র কবে সমাজতন্ত্রের জন্য বৈষয়িক ও আত্মিক পূর্বশর্ত গড়ে দেবে, তার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে এমন নয়। অপুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের একটা পর্বের মধ্যে দিয়ে তারা সমাজতন্ত্রে চলে আসতে পারে।

অপুঁজিতান্ত্রিক পথ হল পশ্চাৎপদ দেশ ও জনগণের

* Lenin V. I. *Collected Works*, Vol. 31, p. 244.

পক্ষে পুঁজিতান্ত্রিক পর্যায় এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার একটা প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পর্ব। এই পর্বে রাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্যে গড়ে তোলা হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈষয়িক ও আর্থিক পূর্বশর্ত।

ভূতপূর্ব উপনিবেশটা বিকাশের কোন স্তরে ছিল, তা নির্বিশেষেই কার্যকৃত হয় সমাজতন্ত্রমুখিতার বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যবস্থাাদি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে, ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী শক্তিরূপ, প্রতিষ্ঠিত হয় বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক শাসন, যা জনগণের স্বার্থ প্রতিফলিত করে ও নির্ভর করে মেহনতিদের ওপর, শাসনযন্ত্রকে করা হয় গণতান্ত্রিক। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সদৃশ সংগ্রাম চালানো হয়, মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে গড়া হয় আধুনিক শিল্প, রাষ্ট্রীয় মালিকানাযুক্ত কলকারখানা, বৈদেশিক উদ্যোগাদির জাতীয়করণ হয়, কৃষকদের স্বার্থে চলে আমদানি ভূমি সংস্কার, বহিঃরথনৈতিক যোগাযোগের ওপর স্থাপিত হয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। সমস্ত অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর থাকে সাধারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতি হয় পরিকল্পিত, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা থেকে দেশ ক্রমশ মুক্ত হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে প্রধান কাজ হল মেহনতিদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন, শ্রমিক শ্রেণী গঠন, তাদের ট্রেড-ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা, কৃষক, ক্ষুদ্র কারুজীবী ও কুটির শিল্পীদের সংগঠন,

উৎপাদনের পরিচালনায় মেহনতিদের ক্রমশ আকর্ষণ। একই সঙ্গে সংকুচিত করা হয় বৃহৎ পুঁজিপতি ও সামন্তদের অধিকার।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ঘটে, বিপ্লবের আদর্শে নিষ্ঠাবান দেশীয় বিশেষজ্ঞ কর্মিদল গড়ে তোলা হয়, প্রচার করা হয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি।

সমাজতন্ত্রের পথে এগুবার জন্য খুবই গুরুত্ব ধরে ব্যাপক মেহনতি জনগণের স্বার্থরক্ষী বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টি গঠন এবং তার সংহতি। প্রগতিশীল সামাজিক পুনর্গঠনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয় তারা।

সমস্ত সমাজ বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন হল রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন। সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বিকাশের মান, বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি আর তাদের নেতৃত্বের রাজনৈতিক-ভাবাদর্শীয় অবস্থান অনুযায়ী গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রপাট। যেমন জাতীয় গণতন্ত্র, তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা সমস্ত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির একটা ব্লকের ওপর দণ্ডায়মান। হতে পারে আবার পেটিট-বুর্জোয়া বৈপ্লবিক গণতন্ত্র, রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান নির্ভরস্থল সেখানে মূলত কৃষক, শহুরে ও গ্রামীণ বুর্জোয়া, অন্তর্বর্তী সামাজিক গ্রুপ। তৃতীয় ধরনের ক্ষমতা হল প্রলেতারীয়-কৃষক বৈপ্লবিক গণতন্ত্র, যার ভিত্তি মেহনতিদের দুটি বনিয়াদি শ্রেণী — শ্রমিক আর কৃষক। এখানে অগ্রণী বৈপ্লবিক পার্টিগুলি গ্রহণ করেছে তাদের ক্রিয়াকলাপের ভাবাদর্শীয়-রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলিতে রাষ্ট্রকর্মতার যেসব ধরনের উল্লেখ করা হল, শুধু তাতেই বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের বিদ্যমান সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সীমিত নয়।

সমাজতন্ত্রমুখী দেশগুলির রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনশীলতা, কখনো কখনো অস্থিতিশীলতাতে চিহ্নিত। তাতে প্রকাশ পায় সামাজিক-শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির ভেদাভেদ, শ্রেণীর দিক থেকে বৈপ্লবিক গণতন্ত্র সমরূপী নয়। বৈপ্লবিক পুনর্গঠন যত গভীর হতে থাকে, এ প্রক্রিয়াও ততই প্রকট হবে, তবে আগে থেকে বলে দেওয়া যায় না কোন রাজনৈতিক শক্তিটা আধিপত্য করবে।

প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক যেসব শক্তি ও আন্দোলন সমাজতন্ত্র আর কার্যক্ষেত্রে তা রূপায়ণের পথ নিয়েছে, তাদের সমর্থন করে সমাজতান্ত্রিক দেশেরা। এইসব দেশের সঙ্গে তাদের বহিঃরথনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বের সামাজিক নবায়নে অংশ নিচ্ছে কোটি কোটি লোক, সমস্ত মহাদেশের অসংখ্য কমিউনিস্ট, বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা। পৃথিবী অনেক এগিয়ে এসেছে সেই নবসভ্যতার দিকে, যার ভিত্তি পত্তন করেছিল রাশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব। কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম মতবাদের স্রষ্টা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের বৈপ্লবিক তত্ত্বের প্রাণশক্তি।

লেনিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর অন্যান্য দেশেও তা ঘটবে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের নীতিগত এই প্রতিপাদ্য সমর্থিত হয়েছে বাস্তব জীবনে। বর্তমানে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন

আমেরিকার কোটি কোটি লোক চলেছে সমাজতন্ত্রের পথে। নিজেদের নিঃস্বার্থ শোষণমুক্ত শ্রম দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণ প্রবর্তন করছে সেই নবসভ্যতার, বহুকাল থেকে যার স্বপ্ন দেখে এসেছেন মহাপুরুষেরা, যার বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদন দেন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন। বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশগুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে বর্তমান সমাজবিকাশের নির্ধারক কারিকা, পুঞ্জিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা খুলছে তার দিকে।

রাশিয়ার বিপ্লব জাগিয়ে তোলে প্রাচ্যকে, দেখা দেয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল জোয়ার যাতে ধূলিসাৎ হয় ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা। অনেক দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম পরিবিকশিত হচ্ছে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলি পরিণত হয়েছে বর্তমান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটা প্রধান শক্তিতে।

বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবন যে বিকশিত হচ্ছে সেই দিকে যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সেটা দৈবাৎ নয়। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব কেবল সমাজবিকাশের অবজেকটিভ নিয়মবদ্ধতাই উদ্ঘাটিত করে নি, কী কী শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক শক্তি আধুনিক প্রগতির ধারক ও বাহক, কারা তার বিরোধী, সেদিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়াধের একটা তুমুল বিস্ময় হল বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব, উৎপাদনী শক্তি, টেকনিক, বিজ্ঞান বিকাশের অপরিসীম সম্ভাবনা দেখা

দিয়েছে তাতে। কিন্তু বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে তার পরিণামে দেখা দিয়েছে ব্যাপক বেকারি, 'অनावশ্যক' হয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ লোকের দারিদ্র্য। বদভুক্ষা পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার তীক্ষ্ণতম সমস্যা হয়েই থেকে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোকের বাসস্থান নেই, থাকে তারা মাথা গোঁজার পক্ষে অনুপযোগী ঘিঞ্জি সব বস্তিতে। একচেটিয়ার মনোফার জন্য ধ্বংস করা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ — মাঠ, বন, সাগর, ভূগর্ভ, বায়ুমণ্ডল।

এমন সামাজিক পরিস্থিতি গড়া কি সম্ভব যাতে কোটি কোটি মেহনতির, পৃথিবীর সমস্ত মানদুখের স্বার্থ মিটবে? বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব তাতে কেবল 'হ্যাঁ' বলে না, কিভাবে তা সম্ভব, তার পথও দেখায়। বলাই বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম বর্তমান কালের সমস্ত প্রশ্নের তৈরি জবাবের একটা সংহিতা নয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আপ্তবাক্য নয়, কর্মের দিগ্‌দর্শন। বর্তমানেও কমিউনিস্টরা তাদের বৈপ্লবিক তত্ত্বের বিকাশ নিয়ে সৃজনশীলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন, নতুন নতুন তথ্য ও ঘটনার, বিশ্বের সামাজিক নবায়নের জন্য সংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণে তাঁরা সর্বদা সচেতন।

মানবজাতির সামাজিক তৎপরতা সম্ভব কেবল শান্তির পরিবেশে। শান্তি রক্ষার সমাজতান্ত্রিক শিবিরের, সর্বাপ্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রয়াস সর্বস্বীকৃত। এই মহারতে, যুদ্ধবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জোট-বহির্ভূতি আন্দোলন, জাতিসংঘের গঠনমূলক উদ্যোগাদির

ভূমিকাও বিপুল। কমিউনিস্টরা মনে করে যে বর্তমান
কালে বিশ্ব যুদ্ধ একটা অমোঘ নির্বন্ধ নয়, মেহনতিদের
উচিত তাদের ঐক্য আর যুদ্ধবিরোধী ট্রিয়াকলাপ দ্বারা
শান্তি রক্ষা। সমাজতান্ত্রিক দেশেরা, বিশ্ব কমিউনিস্ট
আন্দোলন এটাকেই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য
করে। আর দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক
বিতর্কের সমাধান হওয়া উচিত শান্তির পথে, শান্তিপূর্ণ
সহাবস্থানের ভিত্তিতে। সমাজতন্ত্র এরূপ প্রতিযোগিতায়
ভীত নয়, কেননা তার চুড়ান্ত বিজয়ে সমাজতন্ত্র
নিঃসন্দেহ।

ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থ

অপূর্জিতান্ত্রিক পথ — বিকাশের অপূর্জিতান্ত্রিক পথায় এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে যেতে সচেষ্ট দেশগুলির পক্ষে বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় একটা পর্ব।

আন্তর্জাতিকতা — সাধারণ লক্ষ্যের জন্য সংগ্রামে সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণী, কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক একাঘাতা, তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় মর্দুস্তি ও সামাজিক প্রগতি জন্য জনগণের সংগ্রাম সমর্থন।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র — সাম্য, ষোঁথ মালিকানা, সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক শ্রমের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থার আদর্শ উত্থাপক সমাজচিন্তা, যার অনেকটাই কল্পনাশ্রিত।

ইতিহাসের সাবজেক্টিভ করণিকা — অবজেক্টিভ (ইচ্ছাবাহিত্ত্ব বাস্তব) সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, বিকাশ বা রক্ষণের জন্য সাবজেক্ট বা বিষয়ীর (জনগণ, শ্রেণী পার্টি, ব্যক্তিবিশেষ) ক্রিয়াকলাপ।

উৎপাদনী শক্তি — উৎপাদন করার উপায়াদি, যন্ত্রপাতি এবং সেগগুলির চালক লোকেদের সমষ্টি। যেকোনো সমাজের প্রধান উৎপাদনী শক্তি হল শ্রমজীবী, যারা উৎপাদন বিষয়ে নির্দিষ্ট খানিকটা জ্ঞান, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতার অধিকারী।

উৎপাদনী সম্পর্ক — সামাজিক উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক। লোকেরা বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে একা-একা নয়, অনেকে মিলে, আর সে প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়।

উৎপাদনের প্রণালী বা ধরন — জীবনধারণ, ব্যক্তিগত পরিভোগের জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ আহরণের ইতিহাসনির্দিষ্ট পদ্ধতি। এটা হল উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদনী সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বিক ঐক্য ও প্রতিক্রিয়া। উৎপাদনের প্রণালীর সবচেয়ে সচল ও বৈপ্লবিক উপাদান হল

উৎপাদনী শক্তি, তার বিকাশে নির্দিষ্ট হয়
উৎপাদনী সম্পর্ক।

একচেটিয়া — বড়ো বড়ো পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক
সংঘ, সর্বোচ্চ মূল্যফা নিঙড়ে নেবার উদ্দেশ্যে
যারা নির্দিষ্ট কতকগুলি সামগ্রীর উৎপাদন
ও বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায়। সাম্রাজ্যবাদের
পরিস্থিতিতে পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের প্রধান
রূপ।

কমিউনিজম — পুঁজিতন্ত্রকে হটিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত
সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কমিউনিজমের
প্রথম পর্যায় হল সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক
সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপক্বতার
পর্যায়ে সমাজতন্ত্র ক্রমশ পরিবর্তিত হয়
কমিউনিজমে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে
কমিউনিজমের বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল ভিত্তি গঠন,
কমিউনিস্ট সামাজিক সম্পর্কের বিকাশ,
কমিউনিস্ট সামাজিক আত্ম-পরিচালনার
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপাটের উন্নয়ন। নতুন মানুষ,
সর্বাপ্রাণী বিকশিত ব্যক্তিসত্তা গঠন।

কমিউনিজমবিরোধিতা — বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল
শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ
ও রাজনীতির প্রধান ধারা।

গণতন্ত্র — রাষ্ট্রের রূপ, তার ভিত্তি নাগরিক অধিকার
ও স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তার অনুসরণক্রমে

জনগণকেই ক্ষমতার উৎস বলে স্বীকৃতি। শ্রেণী
রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চরিত্র শ্রেণীমূলক।

জাতি — নির্দিষ্ট একটা ভূখণ্ডের অধিবাসী,
অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতে
ঐক্যবদ্ধ, একই ভাষাভাষী এবং স্বকীয়
ধরনের সংস্কৃতি ও চরিত্রের জনগোষ্ঠীর মেল যা
গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়। পুঞ্জিতন্ত্রের
উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দানা বাঁধে জাতি।

জাতিবাদ — জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ভাবনাশ্রিত
বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও
পলিসি, যা স্ব জাতির স্বার্থকে অন্যান্য
জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে রাখে। নিপীড়িত
জনগণের জাতীয়তাবাদ — বৈদেশিক পীড়নের
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে একটা ঐতিহাসিক
ন্যায্যতার অধিকারী।

**জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত যথানুপাতিক বিকাশের
নিয়ম** — সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ম। তাতে
প্রকাশ পায় একক সমগ্র হিসেবে জাতীয়
অর্থনীতির সুযম পরিচালনার অবজেক্টিভ
আবশ্যিকতা। নানা ধরনের উৎপাদনের মধ্যে
উপযুক্ত অনুপাত স্থাপনের সামাজিক প্রয়োজন
অনুসারে সচেতন প্রয়াসে নিয়মটি বাস্তবে
কার্যকর হয়।

জাতীয় আয় — বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বছরের

মধ্যে পুনরুৎপাদিত সামগ্রীর নীট মূল্য
(উৎপাদনের জন্য ব্যয় ধর্তব্য নয়)।

জীবনধারা — ক্রিয়াকলাপ, সম্পর্ক, মেলামেশা ও
আচরণের রেওয়াজ, বা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা
দ্বারা নির্ধারিত এবং প্রকাশ পায় তাদের
ক্রিয়াকলাপের (শ্রম, জীবনযাত্রা, অবসর বিনোদন
ইত্যাদি) সুনির্দিষ্ট ধরন হিশেবে।

জীবনযাত্রার মান — ব্যক্তি অথবা সমাজের বৈবয়িক ও
আর্থিক চাহিদা মেটানোর মাত্রা যা অর্থ বা
দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে সরাসরি পরিমেষ।

জীবপরিবেশ সংকট — পুর্নজিতান্ত্রিক জগতে প্রধান
প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্দাম আহরণ আর
পরিবেশ দূষিতকরণের ফলে মানবজাতির
অস্তিত্বই বিপন্ন করে তোলার অবস্থা।

নয়া-উপনিবেশিকতা — ভূতপূর্ব উপনিবেশ ও আধা-
উপনিবেশগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতির
পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের
ওপর যে অসম সম্পর্ক চাপিয়ে দেয় তার
ব্যবস্থাধারা।

পুর্নজিতন্ত্র — উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত
মালিকানা এবং মজদুর-খাটানো শ্রম শোষণের
ভিত্তিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।
সামন্ততন্ত্রকে হটিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত এবং

কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের
পূর্ববর্তী ব্যবস্থা।

পুঁজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্ব —
পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক
রূপান্তরের কাল। শুরু হয় শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে এবং সম্পূর্ণ হয়
সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ নির্মাণে।

পুঁজিতন্ত্রের সংকট — পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃতিগত
অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিরোধের
তীব্রায়ণ।

প্রলোটারিয়েতের একনায়কত্ব — সমাজতান্ত্রিক
বিপ্লব সংঘটনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক
শ্রেণীর ক্ষমতা। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ,
সমস্ত ধরনের সামাজিক ও জাতীয় পীড়ন
অবসানের জন্য, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য তার
ঐতিহাসিক আবশ্যিকতা থাকে।

ফিনান্স গোষ্ঠীতন্ত্র — অতিবৃহৎ আর্থিক পুঁজির
প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ধনী একচেটিয়া সম্ভের
দল।

বস্তুবাদ — বৈজ্ঞানিক দার্শনিক দ্বারা, ভাববাদের
বিপরীতে যা দাবি করে যে বিশ্ব প্রকৃতিগতভাবেই
বস্তুময়, তা রয়েছে লোকেদের চেতনা থেকে
স্বাধীনভাবে, বিশ্বকে জানা সম্ভব, বস্তুসত্তা
আদি, চেতনা পরবর্তী।

বুদ্ধজ্যোতিষ — পুণ্ডিতান্ধিক সমাজে আধিপত্যকারী শ্রেণী, উৎপাদনের উপায়ের মালিক, মজুরি-খাটানো শ্রমের শোষক। বুদ্ধজ্যোতিষের আয়ের উৎস বাড়তি মূল্য।

বৈজ্ঞানিক-টেকনিকাল বিপ্লব — উৎপাদনের সঙ্গে বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্রণী সৃষ্টিতর মিলনে উৎপাদনী শক্তির আমূল গুণগত পুনর্গঠন।

বৈরবিরোধ — শত্রুস্থানীয় শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ ও শক্তির মধ্যে এমন স্বার্থবিরোধ, যার আপোস হয় না। শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে তার সমাধান হয় এক পক্ষের বিজয়ে।

ভাবাদর্শ — রাজনৈতিক, আইনি, নৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক ও দার্শনিক ধ্যানধারণার তন্ত্র। শ্রেণী সমাজে ভাবাদর্শ হয় শ্রেণীগত চরিত্রের।

ভাববাদ — দর্শনে বস্তুবাদের বিপরীত অবৈজ্ঞানিক ধারা। ভাববাদ মনে করে আদি, প্রাথমিক হল আত্মা, ভাবকল্প, চেতনা, পক্ষান্তরে, প্রকৃতি, বস্তুসত্তা, অসিদ্ধ হল গৌণ।

মুদ্রাস্ফীতি — অত্যধিক পরিমাণে কাগজের মুদ্রা ছেড়ে সঞ্চালনের ক্ষেত্রে ভারাক্রান্ত করে তোলা। এর ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং আসল বেতন হ্রাস পায়।

যুগ — এক থেকে অন্য উত্তরণ অবাধ সমাজব্যবস্থার
ঐতিহাসিক বিবর্তন কাল।

রাজনীতি — রাষ্ট্রক্ষমতা, তার চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ
প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী, সামাজিক গ্রুপ, জাতি, ও
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত
সামাজিক জীবন।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র — পুঁজিতন্ত্রের সর্বোচ্চ
পর্যায়, তার বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধোন্মত্ত রাষ্ট্রের
প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াগুলির
ক্ষমতার মিলন।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব — বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে
রাষ্ট্রের স্বাধীনতা।

শোধনবাদ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অবৈজ্ঞানিক
সংশোধন, তথাকথিত পুনর্বিচার। 'দক্ষিণপন্থী'
শোধনবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্থলে আনে
বুদ্ধোন্মত্ত-সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আর 'বামপন্থী'
শোধনবাদ আনে নৈরাজ্যবাদী, 'অতিবৈপ্লবিক'
প্রস্তাবাদি।

শ্রমিক শ্রেণী — বর্তমান সমাজের সবচেয়ে অগ্রণী ও
প্রগতিশীল শ্রেণী। পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় তারা
উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত, তাই বুদ্ধোন্মত্তরা
তাদের শোষণ করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক
দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী হল প্রধান এবং
পরিচালক শক্তি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী

পার্টির নেতৃত্বে তারা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম
নির্মাণের ব্যবস্থা করে।

সংস্কার — বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার চৌহিন্দির মধ্যে, তার
শ্রেণী চরিত্রে বদল না ঘটিয়ে সমাজজীবনের
কোনো একটা দিকের পরিবর্তন।

সমরবাদ — যুদ্ধের আয়োজন এবং দেশের অভ্যন্তরে
মেহনতিদের সংগ্রাম দমনের উদ্দেশ্যে
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অন্তর্দৃষ্টি সামরিক
শক্তি বৃদ্ধির নীতি।

সমাজতন্ত্র — পুঁজিতন্ত্রের স্থলে আগত সমাজব্যবস্থা,
কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়। তার বৈশিষ্ট্য:
উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানা,
মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান,
বন্ধুস্থানীয় শ্রমজীবী শ্রেণী ও স্তরের অস্তিত্ব,
জনগণের ক্ষমতা, সমাজের পরিকল্পিত বিকাশ।
সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য জনগণের বর্ধমান
বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জাহিদা ক্রমেই পূরোপূরি
মেটানো।

সমাজতন্ত্রমুখিতা — জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিবিকাশের লক্ষ্যে
সামাজিক পুনর্গঠনের ধারা।

সমাজতান্ত্রিক জীবনধারা — লোকেদের এমন ক্রিয়াকলাপ,

সম্পর্ক, আদান-প্রদান, আচরণের ব্যবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে, সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের লক্ষ্যে চালিত।

সামন্ততন্ত্র — দাসপ্রথা বা আদিম সমাজব্যবস্থা হটিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত, পুঞ্জিতন্ত্রের পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থা। তার ভিত্তি হল ভূমির ওপর সামন্ত বা ভূস্বামীদের মালিকানা এবং তাদের নিকট উৎপাদক, ভূমিকর্ষকদের আংশিক অধীনতা, বাধ্যতা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের জেরে এইসব জনগণের অগ্রগতিতে, জাতীয় পুনর্জন্ম আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে বাধা দিচ্ছে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — উৎপাদনের প্রণালী, রাজনৈতিক প্রথা, সামাজিক চেতনার রূপে বিশিষ্ট এক-একটা সামাজিক বিকাশের পর্যায়। মানবজাতির ইতিহাসে আছে এই ধরনের কয়েকটি সামাজিক ব্যবস্থার ধারাবাহিক বদল: আদিম, দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, পুঞ্জিতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট।

সাম্রাজ্যবাদ — একচেটিয়া পুঞ্জিতন্ত্র, পুঞ্জিতন্ত্রের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায়; বিশ্বের শোষণ অংশে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রভুত্বের ব্যবস্থা।

সুবিধাবাদ — সংস্কারবাদী পার্টি ও ট্রেড
ইউনিয়নগুলির ফিরাকলাপে অন্তর্ভুক্ত বর্জ্যের
সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রেণীগত আপোস ও
সহযোগিতার তত্ত্ব ও প্রয়োগ।

প্রগতি প্রকাশন

প্রকাশিতব্য

জ. বেরবেশকিনা, ল. ইয়াকভলেভা, দ. জেরকিন।

‘ঐতিহাসিক

বস্তুবাদ কী?’ (সামাজিক-রাজনৈতিক

জ্ঞানের অ-আ-ক-খ)

আলোচ্য বইটির উদ্দেশ্য জনবোধ্য আকারে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণার সারকথাকে পেশ করা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বর্গসমূহ ও নিয়মাবলীর স্বরূপ উন্মোচন, এবং রোজকার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা অবস্থানের তাৎপর্যের প্রতি জোর দেওয়া।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বুনিয়াদী অবস্থানগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক পাঠকদের জন্য বইটি লেখা হয়েছে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও
অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত
পেলে প্রকাশায় বারিত হবে। অন্যান্য
পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার,

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union.

19th June 1996



সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-থ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

✓ অর্থশাস্ত্র কী

✓ দর্শন কী

✓ বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম

✓ দ্বাম্বিক বহুবাদ কী

✓ ঐতিহাসিক বহুবাদপ কী?

পুঁজিতন্ত্র কী

✓ সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়

কমিউনিজম কী

শ্রম কী

উদ্ধৃত-মূল্য কী

সম্পত্তি-মালিকানা কী

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

পার্টি কী

রাষ্ট্র কী

বিপ্লব বলতে কী বোঝায়

উত্তরণ পর্ব কী

মেহনতি মানুষের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী

ISBN 5-01-000810-6